কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল

B3687

SCL Kolkata

অরুণ ভট্টাচার্য

জিজ্ঞাসা
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ॥ কলেজ রো

প্রথম প্রকাশ সন ১৩৬৫

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীচণ্ডী সেন
পি. বি. প্রেস
৩২ই, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা

জীবনানন্দ স্মরণে

হাল আমলে বাংলা কবিতার পাঠক বেড়েছে, বিশেষত আধুনিক বাংলা কবিতার। আমরা কয়েকজন কবি-বন্ধু মিলে প্রায় ছ' সাত বছর আগে যখন 'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলন করেছিলাম তখনও সঠিক বুঝতে পারিনি যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এমন একটা অঘটন ঘটবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কবিদের বই-এর সংস্করণ এক বছরে, কখনও বা তারও পূর্বে, শেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, কবিতা-পাঠ ও কাব্য বিষয়ে আলোচনা ব্যতিরেকে এখন কোন সংস্কৃতি সম্মেলন পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিগত দশ বৎসরে বহু তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন, কিছু ভাল কবিতাও আমরা পেয়েছি, সর্বোপরি কবিতার প্রতি একটি মমত্ববোধ জেগে উঠছে।

কিন্তু দুঃখের কথা, বাংলা আধুনিক কবিতার পরীক্ষানিরীক্ষা, আঙ্গিক কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা এখনো হচ্ছে না। এ কাজ কবিতার সহৃদয় সমালোচকের এবং কবিদের নিজেদেরই করবার কথা। সেকারণে কবিতার বই যে হারে প্রকাশিত হচ্ছে, কাব্য সমালোচনার বই সে তুলনায় প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয় না।

যে কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পেছনে লেখকের নিজস্ব সমালোচনারও একটা দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। চিন্তাশীল কবি কখনো না কখনো, নিজের রচনা সম্বন্ধে অথবা অন্যের, ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও মোহিতলাল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি সবাই নানা সময়ে তাঁদের চিন্তার কথা, ভাবনার কথা আমাদের জানিয়েছেন। আমরা নিজেদের তাঁদেরই উত্তরসাধক হিসেবে দাবী করলেও এ বিষয়ে এখনো সচেতন হয়েছি বলে মনে হয় না। অথচ এ কাজ না করলে বড় একটি কর্তব্য পালন করা হবে না।

বিগত ন' দশ বছরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইতস্তত ছড়ানো লেখাগুলিকে একত্র করে, বেছে এবং যথাসম্ভব সাজিয়ে দেখা গেল আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনার একটা সূত্র এর মধ্য থেকে পাওয়া যাবে। নানা সময়ে অন্যের কবিতা পড়তে পড়তে বা নিজের রচনাকালে কবিতা সম্পর্কে অনেক কিছু মনে হয়েছে; কবির একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, রচনা-প্রক্রিয়া, তার

উৎকর্ষের কথা, কলাকৌশলের দিক সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তা করতে গিয়েও কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেকারণে বইটি দুটি পর্বে সাজাতে হ'ল। কবিতা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল বিষয়গুলি, কাব্যের রূপ, উৎস ও বিভিন্ন ধারা প্রকরণ ও রসবস্তুর আলোচনাগুলিকে 'কবিতার ধর্ম' এই পর্যায়ের অন্তর্ভূত করা হ'ল। এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সমর সেন পর্যন্ত এই বিস্তৃত ধারাকে 'বাংলা কবিতার ঋতুবদল' পর্যায়ভুক্ত করা গেল। হাল আমলের ইংরেজী কবিতার আলোচনা না দিলে এ বই এর উদ্দেশ্য সফল হবে না মনে করে পরিশিষ্টে উল্লিখিত আলোচনাটি যুক্ত হ'ল। পূর্ব বাংলার কবিতা সম্পর্কে আমরা কিছুটা উদাসীন। অথচ এক সময়ে পূর্ব বাংলার বিস্তৃত নদী প্রান্তর অধ্যুষিত অঞ্চলই বাংলা কাব্যের পটভূমি ছিল। এখনো সৃষ্টিশীল কাব্যচর্চার উৎসাহে পূর্ব বাংলার তরুণ কবিকুল আমাদের অগ্রণী। বইটির পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারব, এ মত আশা রাখছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পর প্রবন্ধটি দীর্ঘ দিন পূর্বে রচিত; কিছুটা পরিমার্জনা করে প্রকাশ করলেও ইতিমধ্যে লেখকের বক্তব্য অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রকাশকের উৎসাহ ব্যতিরেকে এ বই এত শীঘ্র প্রকাশিত হ'ত না। প্রবন্ধ এবং আলোচনা গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশ করে তিনি সুধীমহলে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বন্ধুবান্ধব অনেকেই এ বই সম্পর্কে উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের সকলের কাছেই আমার ঋণ রইল।

গ্রন্থকার

কলকাতা সন ১৩৬৫

। সূচীপত্র ।

কবিতা-বিষয়ক প্রস্তাব

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ থেকে মাইকেল অথবা মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতার ধারাবাহিক চর্চার চাইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে যে বৃহৎ কবিসমাজ গড়ে উঠেছে তাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা নগণ্য নয়, এবং সিদ্ধিলাভ, যদি রসের বিচারে বিবেচ্য হয়, তাহলে আংশিক যে ঘটেনি এমন কথা আধুনিক কবিতার অতি নিষ্ঠুর সমালোচকও সম্ভবতঃ বলবেন না। সম্প্রতি এ কথা অনেক কবিই মনে মনে ক্রমশঃ যেন স্বীকার করছেন, বিষয় এবং বস্তু, নিরপেক্ষ হলেও, কাব্যের মূল উপজীব্য নয়, তত্ত্বকথা তো নয়ই; বরং কাব্যরচনার বিশেষ ভঙ্গিই কবিতাকে দাঁড় করায়, তার নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। বহু প্রাচীনকালে সংস্কৃত চর্চার যুগে অবশ্য এক সম্প্রদায়ের আলংকারিকরা এই ভঙ্গী বা রীতিকে প্রাধান্য দিলেও, সমস্ত কিছুর অতিরিক্ত একটি সুষম ব্যঞ্জনাকেই অধিকাংশ সমালোচক কাব্য-রসের চরম আস্বাদ বলে মেনে নিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার বর্তমান অবস্থা সে সময়েরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত অনুভূতির সার্বভৌমতা, চেতনাপ্রসূত ঐকান্তিক বোধ, বিশ্বব্যাপারের নানান্ দেখাশোনায় যে অপরিসীম তাৎপর্য তারই অখণ্ড অমলিন চমৎকারিত্ব—পরিশেষে এবম্বিধ স্থির দর্শনের রূপ প্রত্যক্ষ করা—কবিরই প্রাথমিক দায়িত্ব বলে কি অগ্রজ কি হালের তরুণ কবিও মনে করেন, তাদের রচনার দিকে নজর দিলে এমন ধারণা হবে। কেননা যে নির্দিষ্ট ভঙ্গি বা রীতির স্বকীয়তায় এদের বিশিষ্টতা তা অনুরূপ মানসিক গঠনেরই রূপ-বিন্যাস। রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কবিতার যৌবন কেটেছে নানা দ্বিধা শংকায়, বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহে; এখন পরিণতির কালে এসে তার একটি স্পষ্ট রূপ চোখে পড়ছে। 'মনুষ্যসংসারের অধিকাংশ ব্যাপার যখন দেহাচারের কল্যাণেই চলে, তখন কেবল কলা-কৌশলের মধ্যে পরমাত্মার লীলাকৈবল্য খুঁজতে আমি প্রস্তুত নই'—একথা

সুধীন্দ্রনাথের না হয়ে অন্য কোন মহৎ কবিরও হোতে পারতো, কেননা যে-কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সে সম্ভবতঃ সাধারণ সত্য, অন্ততঃ একালের কবির পক্ষে। এই যে ভঙ্গি, এ তো কেবলমাত্র কলাকৌশল নয়, সমস্ত চরিত্রটুকুই কবি নিঃশেষে তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন; এবং কখন যে সেই ভঙ্গি তার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বোধ ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যে ও শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেকথা হয়তো কবির কাছেও অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। প্রতিদিনের বেঁচে থাকায়, কাজে কর্মে, অকাজে আলস্যে, উৎকণ্ঠায় আবেগে, মলিন অমলিন অভিজ্ঞতায় মনের মধ্যে নিয়তই যে টানাপোড়েন চলতে থাকে এক অশেষ ক্ষমতা তাকে আশ্চর্য সমগ্রতায় জড়িয়ে রাখে, ভাব অনুভাবের কল্পনার বুনুনিতে দিনরাত্রির চলাচলকে গেঁথে রাখে। ক্রমশঃ সংহত হয়, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে তার মানসিকতা নিজেকে ভরে তোলে। আধুনিক বাংলা কবিতার কারুকর্মে যে কয়জন কবির নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করেছি তাদের রচনায়,—কাব্যসৃষ্টিতে হোক অথবা কাব্যের মৌল তত্ত্ব আলোচনায় হোক—উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ ইঙ্গিত পেয়েছি।

এবং কবির ও কাব্যের বিশ্লেষণী প্রতিভা যে অভিন্ন একথার নজির যেমন ইংরেজী কাব্য ইতিহাসে রয়েছে সম্প্রতি তেমনি বাংলা কাব্যের প্রান্তভূমিতেও তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই অখণ্ডতার এ পিঠ আর ও পিঠ' (স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) এমন কথা বহু পূর্বেই আধুনিক কবিরা স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত অথবা অধ্যাপক সমালোচকের 'পরই বাংলা কাব্য সাহিত্যের পাঠকপাঠিকার আস্থা বেশী[১], অন্যদিকে কবিরাও স্বয়ং সমালোচনা-পর্বকে এড়িয়েই চলেন। অথচ কাব্যজিজ্ঞাসা, রসবিচার বা কবিতার উৎপত্তি বিষয়ক চিন্তাভাবনা এবং এতদ্ প্রসঙ্গে স্থির আলোচনা কেবলমাত্র সচেতন কবি-মানসের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণের পক্ষে চেতনা ও অনুভাবনার সেই গভীরে প্রবেশ করা প্রায় দুঃসাধ্য যেখানে কবিতার জন্ম।

১ সমালোচকের তিনটি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন বলে আই, এ, রিচার্ডস্ যে উল্লেখ করেছেন বস্তুতঃ তা একমাত্র কবিতেই বর্তায় :

He must be an adept at experiencing the state of mind relevant to the work of art he is judging...he must be able to distinguish experiences from one another,......he must be a sound judge of values.

সন তারিখের হিসেব অথবা রচনাবলীর লম্বা ফিরিস্তি দেওয়াই তাদের সমালোচনায় স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডেও, দুচারজন ব্যতিরেকে (ব্রাডলী, মিডলটন মারে অথবা কার, রিচার্ডস-এর মত সমালোচক) সকল সমালোচকই কবি, প্রায় প্রথম শ্রেণীর কবি। এবং হয়ত তাই স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর একাজ যে ক'একজন কবি করেছেন তার মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য মোহিতলাল ও সুধীন্দ্রনাথ। অংশতঃ বুদ্ধদেব বসু ও প্রমথনাথ বিশী[২]। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের বইটি (কবিতার কথা: জীবনানন্দ দাশ) এই প্রসঙ্গে তন্নিষ্ঠ আলোচনার দাবী রাখে। প্রধানতঃ তিনি একজন কবি এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যের স্বরূপ, রসবস্তু, উৎপত্তিবাদ ইত্যাদি মৌল তত্ত্বেই নিবিষ্ট। এবম্বিধ দুটি কারণেই এই গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বাংলা কাব্য সমালোচনা, বিশেষতঃ মৌল বিচার এতই অপ্রতুল যে এ ধরণের প্রচেষ্টা মাত্রই প্রবীণ ও নবীন কবি সম্প্রদায়ের কাছে সমাদরে গৃহীত হবে। হালের মানসিকতা এরূপ চটুল এবং খবরের-কাগজী সমালোচনার ধরণ এমনই গভীরে সৎ চিন্তাশীলতাকেও দূষিত করেছে যে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যসুষমা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। কৌলিন্যের এমন দুর্গতির মুখে মৌল ও আত্মগত চিন্তাধারাই সম্ভবতঃ আমাদের অবিরল সৃষ্টিকার্যে নতুন করে প্রেরণা দিতে পারে, একই সঙ্গে চিন্তার দৈন্য ও বর্তমান সময়ের দুরপনেয় মানসিক ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়াও হয়ত অসম্ভব নয়।

যিনি দীর্ঘদিন নিরলসভাবে কবিতার চর্চা করে যাচ্ছেন তার মনে মধ্যে মধ্যে একথাও উদিত হয়, কি করে আমি লিখি, কেন লিখি, কেন সে লেখা কখনো ভালো, কখনো মন্দ হয়, কেনই বা সাধারণ পাঠক তা পড়ে কখনো নিরানন্দ, কখনো আনন্দ পেয়ে থাকেন। কবিতার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গই বা কি, রস, ধ্বনি অথবা নানাবিধ বিচার্য বিষয় নিয়েই বা আলঙ্কারিকরা মাথা ঘামিয়েছেন কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সচেতন কবিমাত্রই এবম্প্রকার চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পীড়িত হবেন। পীড়িত হবেন, কেননা এ সকল প্রশ্নের কোন সহজ সরলীকরণ নেই, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য বস্তুর মত সর্বজনগ্রাহ্য মত

২ অংশতঃ বলবার উদ্দেশ্য এঁরা কেউই কবিতার মৌল আলোচনায় যান নি।

নেই। বস্তুতঃ ভর করবার কোন নিশ্চিত খুঁটিও নেই। অতএব মত ও পথের অন্ত নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক কবিই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা অনুভূতি উপলব্ধির পথে এগিয়েছেন; তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, সত্য দর্শন অনুযায়ী কাব্যের পরিমণ্ডলকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। অনেকের চোখে দেখা সুন্দরকে, অনেকের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে, দেশ কালের গণ্ডির মধ্যে কোন কোন কবি ধরে রাখতে পারেন; তাঁরা মহৎ কবির পর্যায়ে পড়েন—হাল আমলে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ অথবা বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এমন সব দেখা শোনার, কঠিন করুণ অভিজ্ঞতার, জগৎ সংসার বিষয়ের নির্মল প্রত্যয়ের আভাস ইংগিত রয়েছে। কবির কাজ সরলীকরণে, সমগ্রতার ঐকান্তিক বোধে—যদিচ প্রত্যেকেরই আচার আচরণ ভিন্ন, বিভিন্ন সড়কে তাদের দ্বিধাহীন গতিবিধির ইতিহাসও অস্পষ্ট। তবু কিছু কিছু কবি একান্তই ব্যক্তিগত তাগিদে এসব কথা নিয়ে নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, সম্ভবতঃ যবে থেকে কাব্যরচনা চলছে তবে থেকেই রচনার হেতু নিয়ে জটিল জটলার সূত্রপাত হয়েছে। কবি নিজেই নিজের কাছে নানা প্রশ্ন করে তার সম্ভাব্য উত্তর দেবার প্রচেষ্টা করেছেন, নিজের মুকুরে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মনের নানা চেহারার কাটা-ছেঁড়া করেও সুস্থির থাকতে পারেন নি, কেননা সদুত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলেনি। এ বিষয়ে বন্ধুরা মিলতে পারেন নি এক সূত্রে। গুরুশিষ্যেও মত-বিরোধ হয়েছে। কবিতা বিষয়ে কোলরিজ যা বলেছেন ওয়ার্ডস্বার্থ তা মানেননি। সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী তা স্বীকার করেননি। শিল্পের এই আশ্চর্য চাতুরীই, হয়তবা, আমাদের এর প্রতি আরো আকৃষ্ট করেছে।

যদি কোন কবি এরূপ বলেন, নানাপ্রকার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিবিধ বস্তু ও বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পারলে সেই দিনই কাব্যের জন্মতিথি[৩] তাহলে সম্ভবতঃ প্রবীণ ও নবীন কারুরই আপত্তি হবার কথা নয়, যদিও এসব ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত বহুকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। এই সরলীকৃত প্রতিপাদ্যটি মেনে নেবার কারণ হয়তো এই যে কবি নিজেকে

৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্বগত (প্রথম সংস্করণ)

সহৃদয় পাঠক মনে করেই কবিতা পাঠান্তে একটি সাধারণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সদুত্তর খোঁজবার প্রয়াস করেছিলেন। এবং আশ্চর্য আরো এই, কবিতার গোড়ার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যকে জীবনানন্দের নিজের কথার পরিপূরক বলে মনে হবে। বিষয়টি প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হ'ল : "সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়, কিম্বা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিষই অনেক-দিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল ; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরাণ রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে ; এই সবের অপরূপ উদ্গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে উঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে।"[৪] স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, এ নিছক কথার কথা নয়, বহুদিবস নিরলস কাব্যচর্চার পর এই কবি সচেতনভাবে কবিতা বিষয়ে নানান্ মননপ্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করেছেন। কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত উদ্ঘাটনের মত পরম বিস্ময়কর ঘটনা জগৎসংসারে খুব কমই রয়েছে, (যার তুলনা কেবলমাত্র শিল্প ও সঙ্গীতের জগতেই সম্ভব) এ প্রচেষ্টা শুধু দুরূহতায় শেষ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে উক্ত কবির সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার ফল। যখন যেমনটি মনে হয়েছে, বিভিন্ন ও বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে কাব্য-বিবেচনার কষ্টিপাথরে সফলতার বিফলতার প্রশ্নের উত্তরে নির্মল প্রত্যয় অধিগত হলেই এমনটি সম্ভব হয়।

উপরোক্ত দুটি বর্ণনার উপলক্ষ্য এক ; বৈসাদৃশ্য যত না আছে, সাদৃশ্য তার চেয়েও অনেক বেশী। এবং আশ্চর্য হওয়ার কারণ এই যে দু'জনার কবিতা পড়ে গেলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে, এরা তো ভিন্ন জাতের,

৪ জীবনানন্দ দাশ—কবিতার কথা

সুতরাং এক ধারণায় পৌঁছলেন কি করে। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে এ কথা প্রতীয়মান হবে যে দুজনার রীতিতে আমূল ব্যবধান থাকলেও মহৎ কবিতার বীজ উভয়ের কাব্যে স্পষ্টতঃই বর্তমান। ব্যক্তি-জীবনকে বৃহত্তর সমাজমানসের অঙ্গীভূত করে নেওয়ায় এক ধরণের মূল্য-বোধের প্রয়োজন হয়, সে মূল্য নিছক ব্যবহারিক জগতের লেন-দেনের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়; তার মধ্যে একটা মুক্তির নির্দেশ আছে। সে-মুক্তি অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তা ভাবনার স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তির 'পর নির্ভরশীল। সকল অস্তিত্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েও তার একান্ত গোপন সুরটিকে নিরন্তর উপলব্ধি করতে থাকার একটি আশ্চর্য মাধুর্য আছে; বিশেষতঃ কবির কাছে এই তত্ত্বটিই পরম তত্ত্ব; সেকারণে বিসদৃশ জগৎসংসারের মধ্যেও, কুৎসিত জীবনধারণ ও অসংযত কোলাহলের মধ্যেও অন্ত একটি নিবিড় ঘন অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা তাকে মুগ্ধ করে রাখে। এমনতর কবিমানসের অধিকারী যিনি তার পক্ষে মহৎ কাব্যের প্রশস্ত পথটি আবিষ্কার করা দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। আলোচ্য কবিদের, আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে আশ্চর্য মিল রয়েছে, অমিলের নানা দিক নিয়ে স্পষ্ট স্বাক্ষর নানাভাবে খুঁজে বার করা গেলেও। সেহেতু, কবিতার জন্মতিথি নির্ধারণ করতে কারুরই ভুল হয়নি। জীবনানন্দের আলোচনার শেষে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে দাঁড় করালে মনে হবে একটি বর্ণনা অপরটির পরিপূরক। জীবনানন্দ যেখানে কাব্যের পরিমণ্ডলকে বর্ণনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে কবির দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। স্বতঃই রীতির কথায় তাকে এসে থামতে হয়েছে—যেখানে কাব্যের প্রকৃত সূচনা। সমগ্র মানুষের নিরন্তর বেঁচে থাকার নানা আশ্চর্য অনুভূতির সরলীকরণ একটি কি দুটি মানুষে এসে বর্তায়, কত আশ্চর্য তিথিলগ্নে সেই সেই বিশেষ ধারণা অথবা বোধ সংহত সংযত হয়ে মনে মনে বুনুনির কাজ করে যেতে থাকে—এর গভীর অথচ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এক কথায় হয়ত সম্ভব নয় এবং হয়ত সেহেতু নানান্ মতের পথের ভীড় সৃষ্টিশীল সমালোচনার মৌচাকে এসে নিরন্তর বাসা বাঁধে। উপায় নেই, কেননা কবি যে, তার নিজের কথা সে বলবেই। সাধারণে সমাদৃত না হলেও।

কবিতার সৃষ্টিব্যাপারের প্রথম বিষয়টির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী জড়িত রয়েছে একটি প্রশ্ন; কাব্যের কারণ কি? এবিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীনকালে

বিস্তর আলোচনা, অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণও হয়েছে বলে শুনেছি। কবি নামক ব্যক্তিটিই যে কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে পুরোপুরি দায়ী একথা মেনে না নিয়েও তাঁরা কবির ওপর গুরু দায়িত্ব আরোপ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন প্রতিভা, কেউ বলেছেন ব্যুৎপত্তি, কেউ বা অভ্যাস, অনেকে বা এর সমন্বয়ী গুণাবলীকেই কবির কাব্যসৃষ্টির কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। আলঙ্কারিকদের মধ্যে সর্বশেষ গুণী জগন্নাথ,—যিনি নিজেও সুকবি ছিলেন বলে জানা যায়—তাঁর ধারণায় কাব্যসৃষ্টির কারণ কেবলমাত্র প্রতিভা। এবং এই প্রতিভা যে একটি বিশেষ শক্তি বিশেষ, যা সকলের অধিগত নয় এবং যা অনেক সময় আকস্মিক, একথাও অন্যান্য পণ্ডিতরা বলে গেছেন। জগন্নাথের পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকরা প্রতিভার স্বরূপ নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং দণ্ডী ও বামনের মত অনুযায়ী প্রতিভার কারণ প্রাক্তন সংস্কার বলেই নির্দিষ্ট হয়েছে। শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধেও তাঁদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কাব্যসৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থ পাশাপাশি চলবে এমন উক্তি ভামহর; এবং বিশ্বনাথ-বর্ণিত বহুল প্রচারিত রসাত্মক বাক্যই যে কাব্য এমন সংজ্ঞার নানা বিশ্লেষণ এ পর্যন্ত হয়ে আসছে। অর্থাৎ রস বস্তুটির প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তত্ত্ব আরো জটিল হয়ে উঠেছে। জগন্নাথ সেকথা পুরোপুরি স্বীকার না করেই সম্ভবতঃ বললেন, যে শব্দ রমণীয় অর্থ প্রতিপাদন করবে তাই কাব্য। অর্থাৎ এই সামান্য আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে সংস্কৃত চর্চার যুগে কবিতার উৎপত্তি, কারণ ও রসবিচার নিয়ে কি পরিমাণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বহু শতাব্দী ধরে চলে এসেছে! জীবনানন্দ যে শুধুমাত্র 'মেমোরেবল্ স্পীচ'কে কবিতা বলে গ্রহণ করতে পারেন নি সেকথা এই ভারতীয় প্রেক্ষিতে আরো সহজবোধ্য হবে বলে মনে হয়। যে শব্দ কেবলমাত্র রমণীয় অর্থ প্রতিপাদন করবে স্বভাবতঃই তা একই সঙ্গে বস্তুপ্রধান ও অলঙ্কারপ্রধান হতে পারে—হয়তো শুধুমাত্র বস্তুপ্রধান বা অলঙ্কারপ্রধান বাক্যকে অকাব্য বলেও রসজ্ঞ ব্যক্তি বাতিল করে দিতে পারেন—তাই 'রস' বস্তুটির নিরন্তর সন্ধান চলতে থাকলো। এখনো সদুত্তর মেলেনি, সর্বজনগ্রাহ্য মতামত তৈরী হয়নি। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ চলছে, চলবে হয়তো।

রসের প্রশ্ন থেকেই তৎসংলগ্ন আরো একটি প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে। কবির দায়িত্ব কি? সত্যি কি তার কোন দায়িত্ব আছে—প্লেজার প্রিন্সিপ্‌ল্ ব্যতীত

অথবা রস পরিবেশন ব্যতীত অন্য কি দায় থাকতে পারে? পাঠকের প্রতি কর্তব্যই বা কে নির্দ্ধারণ করবে। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ ও নবীন দুটি মতামত পাশাপাশি রাখছি।[৫] প্রথম উদ্ধৃতির মূল তত্ত্বই আজকের দিনে মেনে নেওয়া হয়নি। তথাপি, যা কল্পনায় রূপ দেওয়া সম্ভব অথবা উচিত এমন কিছুকে অনুকরণের কথাও বলা হয়েছে—সেক্ষেত্রে শিল্পী বা কবির স্বাধীনতার প্রশ্ন রয়ে গেছে, তার বিবেচনা ও ধারণার পর অনেক কিছুই নির্ভরশীল বলে মনে হতে পারে। দ্বিতীয় বক্তব্য বিশ শতকের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবির, যিনি যুদ্ধের বিভীষিকা ও বেদনাবোধের মধ্য দিয়েই কবিসত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন—যাঁর কাছে কাব্যের মূল তত্ত্ব যদিও করুণাবোধে নিহিত, সমাজ সংসারে তথাপি কবির গভীর দায়িত্বকে যিনি কাব্যবোধেরই পরিপূরক বলে মনে করেছেন। এবম্বিধ ধারণা থেকেই কবির দায়িত্বের প্রশ্ন এসেছে। এক্ষেত্রে কবির অনেক কিছু বলবার ছিল; বোধ করি, তার জীবনদর্শন উৎপীড়িত অশান্ত মানুষকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারতো বলেও তার বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ কি সৃষ্টি করছি, কেন করছি, এর ফলাফলে সমাজজীবনের ক্ষয়ক্ষতি লাভলোকসানের প্রতিও তাকে সচেতন হতে হবে। শুধু নিজস্ব ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনাই, সৃষ্টিকার্যের যন্ত্রণা ও হর্ষই একমাত্র কথা নয়, তার দায় দায়িত্বও প্রভূত।

আর যদি কবির ব্যক্তিগত বিচার বা অভিরুচির প্রশ্নই এক্ষেত্রে আসে, অথচ দায়িত্বের কথা যদি তিনি এড়াতে না পারেন তবে স্বভাবতঃই তার যে-সত্তা কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছে তার বিশ্লেষণেরও আত্যন্তিক দায় পাঠকের তরফে এসে পড়বে। মনোবিজ্ঞানীদের তথ্য অনুযায়ী হার্বার্ট রীড যে 'character' ও 'personality'র দ্বৈত ঘোষণা করেছেন[৬] তাতে কাব্যধারার বিভিন্নমুখিতা স্বতঃসিদ্ধবৎ মিলবে। এবং কাব্যে, বিশেষতঃ ইংরেজী কাব্যে, mysticism, wonder ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাপক ধ্যানধারণা সেহেতু বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে। অর্থাৎ মানসিকতার প্রকৃতি সঠিক নির্দ্ধারিত

---

৫ Aristotle: On the Art of Poetry—The poet being an imitator just like the painter or other maker of likeness, must necessarily in all instances represent things in one or other of three aspects, either as they were or are, or as they are said or thought to be or to have been, or as they ought to be.

W. Owen: All the poet can do is to warn.

৬ Herbert Read—Collected Essays in Literary Criticism.

না হলে কাব্যসৃষ্টির সমস্ত পরিশ্রমই কি অসার্থক হয়ে যাবে না! এবং সংস্কৃত আলংকারিকদের বর্ণনা অনুযায়ী যদি প্রতিভাকেই কাব্যের কারণ বলে অভিহিত করা যায় তাহলে কি এই কবিসত্তার দ্বৈতকে এক অন্বয়ে একই রীতির নিয়ামক হিসেবে যুক্তিবিবেচনা দ্বারা স্থিরতর পথে চালনা করা সম্ভব হয় না! (এক্ষেত্রে প্রতিভা অবশ্য সংস্কারবর্জিত নয়।)

নানা দিক থেকে, কবিতার রূপ ও রসের বিষয়ে আলোচনা করে দেখা গেল কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের পরই কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক কারণ নির্ভরশীল। এ সকল লক্ষণগুলিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা হোল:

(ক) কবিতা অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির ঐকান্তিক ফলস্বরূপ জন্ম নেয়। উক্ত ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজজীবনের অঙ্গীভূত, দেশকালসন্ততির যে ঐতিহ্য চলে আসছে তারই সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্রে আবদ্ধ।

(খ) ব্যক্তিত্ব অথবা চরিত্রের, স্ব স্ব পরিধিতে দৃঢ় সত্য বিশ্বাসের তীব্র এবং জৈব প্রাণনাশক্তি তার অনুভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(গ) রচনাভঙ্গী ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ শুধু নয়, চরিত্রের নানা দিকও সেখানে যেন অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়; কেননা কাব্যবস্তুর সঙ্গে ভঙ্গির যে সম্পর্ক তা কবির পোজ্ নয়, কবির বহুদিনের চিন্তাভাবনা দেখাশোনার একনিষ্ঠ অনুধ্যান। শুধু যে অনুভব ও বস্তুবর্ণনার ভিত্তিতে ভঙ্গি সৃষ্টি হয় তাই নয়, বহু সময়ে, কবিমাত্রই জানেন, ভঙ্গিই কবিতাকে দাঁড় করায়। এই ভঙ্গি নিছক স্টাইল নয়, ব্যাপক অর্থে হতেও পারে বা; কবির মানসক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি।

(ঘ) কবিতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মূলতঃ দুটি উপাদান প্রধান ও কার্যকরী। কাব্যের শরীরে চিত্রময়তা ও আত্মায় গানের তন্ময়তা অপরিহার্য বলেই মনে হয়।[৭] এই চিত্র ও সুরের বিচিত্র জটাজালের ভেতর থেকে কাব্যের এমনই একটি মাধুর্য সৃষ্টি হতে থাকে যা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়নির্ভর হলেও, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ-বেদনার সূক্ষ্ম স্তরে আমাদের নিরন্তর পৌঁছে দেয়।

(ঙ) শব্দ অর্থের ঘনিষ্ঠ ও বিচিত্র যোগাযোগের পরেও একথা বলা যায় যে কবিমাত্রই শব্দব্যবহারে, সঙ্গীতে শ্রুতিব্যবহারের মতই অথবা ছবিতে রঙ ব্যবহারের মতই সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দেবেন। কেননা, যথাযথ

৭ সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা কাব্যে চিত্রময়তাকে নিকৃষ্ট ধরণের শিল্পচর্চা বলেই মনে করতেন যদিও।

শব্দ প্রয়োগেই কবিতার সুনির্দিষ্ট অবয়ব তৈরী হয়। বিশেষতঃ শব্দ প্রয়োগের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য থাকে; প্রথমটি সুর সংযোজনা, দ্বিতীয় চিত্রময়তা, তৃতীয় কবিকুশলতার পরম তত্ত্ব ভাবতন্ময়তা। বস্তুতঃ শব্দ প্রয়োগের এই ত্রিবিধ মূলভিত্তি অনুসরণ করলেই কাব্যের রূপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।[৮]

(চ) পরিশেষে পাঠক হিসেবে প্রশ্ন থাকে, কাব্য পাঠে কি লাভ হল? নাকি আনন্দ, বেদনা; বুঝি তৈরী হল রস, নাকি সব কিছু মিলিয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা যখন মন বলে উঠল, এই-ই তো চেয়েছিলুম এতক্ষণ, এবার পূর্ণ হল হৃদয়। একজন কবি বললেন: কারো বা মনের দিগন্তে চৈতন্যের রঙ আরো বিস্তৃত হবে[৯], অন্য কবির মনে হলো: কবিতা পড়ে মূল্যচেতনা বাড়বার কথা।[১০] আরো নানা কবির নানা কথা মনে হলো। এ সকলই সত্য, কেননা প্রত্যেক খাঁটি কবির কথাই তার অন্তরের কথা। বস্তুতঃ সৎ ও সাহসী কবিতার একটি গুণ স্বাভাবিকতা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যাকে মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে মনে করেছিলেন। এই স্বাভাবিকতা কবির অন্তরের পরিশ্রুত বেদনা-বোধেরই স্বাক্ষর। এখানেই সহৃদয় পাঠক কবির সঙ্গে নিজ হৃদয়ের নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করেন—কাব্যপাঠের নব নব আস্বাদনকে নিজের জারক রসে আত্মগত করে নেন, কাব্যের দ্বিচারিণী সত্তা অখণ্ড সমগ্রতায় মুক্তিলাভ করে।

৮ সঙ্গীতে সুরের ধ্যানরূপ কল্পনায় এবং সুর প্রয়োগে একটি গভীর ও ব্যাপক অর্থ রয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে অনুরূপ গূঢ় তাৎপর্যই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

৯ বিষ্ণু দে: সাহিত্যপত্র, গ্রীষ্ম সংখ্যা '৬৩, পৃঃ ২১৫

১০ জীবনানন্দ দাশ: কবিতার কথা, পৃঃ ২৯

কবিতা গান ও কাব্যপাঠ

সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গের পর পর চারটি কবিতাই বিহারীলাল চক্রবর্তী বাড়ীর ছাদে বেড়াতে বেড়াতে বাগেশ্রী রাগিনীতে গান করেছিলেন—(অবশ্য পরে প্রথম সর্গ ললিত রাগে সুর দিয়েছিলেন, তাল : আড়াঠেকা) সারদামঙ্গল তথাপি গান নয়, এবং একথাই প্রমাণিত হয়, কবিতা ও গানে, উনিশ শতকের মাঝামাঝিও, ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক ছিল না। মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করবার পরও সুললিত গান লেখার—বিশেষতঃ বাংলা টপ্পার—অবসর পেয়েছিলেন। তারও আগে বাংলা কাব্যধারার ইতিহাস তো কবিতা-গানের যুগ্মধারারই স্বাক্ষর বহন করে। ঝিঁঝিট, মাঝখাম্বাজ, দেশ, বাগেশ্রী, গৌড় মল্লার প্রভৃতি রাগ রাগিনীর সুরে, মধ্যমান, আড়াচৌতাল, যৎ, বিলম্বিত একতালায় কবিরা তাদের গান বাঁধতেন; আবৃত্তি অথবা গান আসর জমিয়ে গাওয়া হোত। সাতসমুদ্র পার থেকে য়ুরোপীয় রোমান্টিকতার আভাষ এল, তারপর ব্রাউনিং এর তত্ত্বমূলক কাব্যপাঠের আস্বাদ পেলেন এদেশের কবিরা। সম্ভবতঃ তাঁরা বুঝলেন, একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ত বা মহৎ কাব্যের অন্যতম প্রেরণা। ধর্মীয় জিজ্ঞাসা ও সমাজমানসের অনুধাবন তাকে এতকাল পাঁচালী আর মঙ্গলকাব্যের রসদ যুগিয়েছে, আর প্রেমের, প্রকৃতির অনুভব স্থান করে নিয়েছে গীতিকাব্যে; এ ছাড়াও কবিতার যে অন্য একটি রাস্তা খোলা আছে একথা তাঁরা জানলেন বিহারীলালেরও কিছু পরে। কাহিনী অনুসরণ না করেও কবিতা লেখা যায়, ভালোবাসা, অথবা মান অভিমান বিরহ ব্যতিরেকে কাব্যানুশীলন চলে, ধর্ম বা তত্ত্বকথা উহ্য থাকতে পারে, এ কেমন ধাঁচের কবিতা? এমন কথা বলি না যে পরবর্তীকালের কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম, প্রকৃতি অথবা ধর্ম ও সামাজিক সম্বন্ধবাচক নয়—তা হতেই পারে না, সমস্ত সাহিত্যেই তাই—তবু কাব্যের পরিমণ্ডলে একটি যেন নতুন দিক দেখা গেলো, কাব্যের উৎস-সন্ধানে যারা তৎপর ছিলেন তারা সম্ভবতঃ জানলেন যে কবিমানসে একটি নতুন অধ্যায় যোজিত হল। তার একদিকে রবীন্দ্রনাথের 'পুরুষের উক্তি' অথবা 'নারীর উক্তি' কবিতাটি, অন্যদিকে উর্বশী' অথবা 'মানস সুন্দরী' কবিতাটি। অর্থাৎ মনের এলাকায় সদর দরজার পাশে একটি খিড়কীর দরজার সন্ধান পাওয়া গেল। মানুষের চিন্তাধারায় ভাব

অনুভাবের কথা সহজ সরল করে বলার যে পদ্ধতি ছিল তা হয়তবা বদলে গিয়ে কাব্যচেতনার নতুন মূল্য ধার্য হতে লাগলো। সে সময়কার কবিতার ভাষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। পয়ারের চেহারায় স্বচ্ছ প্রবহমানতা একটি আশ্চর্য গতিবেগ দান করলো, রবীন্দ্রনাথ বাইশ মাত্রাতে কবিতা লিখলেন, অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করলেন কবিরা। চিন্তার রকমফের হওয়াতে কাব্যরীতিরও নানাদিক খুলে গেলো। ইংরেজীতে যাকে বলে psychological pattern—উনিশ শতকের শেষার্দ্ধের বাংলা কাব্যে তার নিদর্শন অপ্রতুল নয়। দ্বিতীয়তঃ সৌন্দর্য পিপাসা মানুষের সহজাত; নানা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে তার যে প্রমাণ রয়েছে তা এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বিস্তৃত। তথাপি নিছক সৌন্দর্যানুভূতিরই যে একটি বিশেষ রকমের আনন্দ আছে, সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে এই সূক্ষ্ম বোধ যে মানবমনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আসছে, একথাও বোধ করি রবীন্দ্রনাথই তার কাব্যে সাহস করে দেখালেন। এর ফলে বাংলা কাব্যে যে বিস্ময়কর ঋতুবদল হলো তা আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আত্মসাৎ করবার ফলে পৃথক করে বোঝবার অবকাশ পাইনি।

উপরোক্ত দুটি ধারাই তৎকালীন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগ্‌দর্শনী। বিশেষতঃ পরবর্তী দু'যুগ ধরে বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনাথের একক কবিপ্রতিভার মন্দাকিনী ধারা। কিন্তু প্রশ্ন এই, রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কবিতায় লিরিক্যাল সুরের প্রাধান্য থাকলেও, সুর সংযোগ করলেন না। নতুন করেই গান লিখলেন। এবং যারা রবীন্দ্রনাথের গান রচনার দীর্ঘ প্রলম্বিত সাধনার খোঁজ রাখেন তারা জানেন, অনুরূপ নজির সহজে মেলে না। অর্থাৎ 'নারীর উক্তি' অথবা 'পুরুষের উক্তি' এমন কবিতা যা নির্জনে একা বসে বসে পড়ার। বার বার অনুসরণে তার গভীর অন্তর্নিহিত ভাবে হয়ত নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত উপলব্ধির সীমানায় তা এসে পড়ে তবে সেই অনুভূতিকে নিজের করে নেওয়াও সম্ভব, কিন্তু আসর জাঁকিয়ে দশজনে মিলে উপভোগ করবার নয়। এ বেদনার কবিতা, নিজের জীবন দিয়ে নানা অভিজ্ঞতার নিরিখে এর প্রাণস্পন্দন। সুতরাং তখন থেকে বাংলা কবিতা আর লিরিক রইলো না, বরং তাতে লিরিক্যাল সুর মাঝে মাঝে বাজতে লাগলো।

ইংরেজীতে wonder (বিস্ময় বলা চলতে পারে হয়ত) বলে যে কথা

পাওয়া যায় তার যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই, কিন্তু বড় কোন শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এ অনুভব একান্ত অপরিহার্য। রোমান্টিসিজ্‌ম তো এরই পরোক্ষ রূপ![1] বিভূতিভূষণের অপূর্ব অন্তহীন আশ্চর্যময়তা অথবা জীবনানন্দের মৃত নায়কের 'বিপন্ন বিস্ময়' আমাদের শিল্পীসত্তার 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' সম্ভবতঃ নিয়তই কাজ করে। যাঁদের চোখে দেখবার আছে এই অপার বিস্ময়:

> ঘাস গাছ রদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে (বুদ্ধদেব বসু)

অথবা যাঁর এমন অনুভব রয়েছে:

> তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রদ্দুরের সুতো (অমিয় চক্রবর্তী)

তাঁরাই কবি। এই বিস্ময়ের পর্দার আড়ালে কখনো বেদনা আছে কখনো পুলক, আর একে জড়িয়ে আছে এক সুগভীর দার্শনিক বোধ যাকে detatchment বলা চলতে পারে। বিশুদ্ধ কবিতা প্রসঙ্গে মিডলটন মারী[2]র অনুধাবন সবিশেষ মূল্যবান বলে মনে করতে রসজ্ঞ পাঠকের দ্বিধা নেই। যে mystery র কথা উনি বলেছেন তা আধ্যাত্মিক নয়। সুতরাং এই mystery বিস্ময় ছাড়া আর কি? যা নিয়ত দেখছি, যা কিছু নিয়ত শুনছি তাই যখন কোন মুহূর্তে বিশেষ হয়ে নিজের কাছে ধরা পড়ে, তার একটি ব্যাপক ও নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ পায় তখনই কাব্যের জন্মলগ্ন এবং এই প্রকাশের মৌল কারণটি বিস্ময়-বোধজনিত। আলংকারিকরা যে আটটি স্থায়ী ভাবের কথা বলেছেন[3] তার মধ্যে বিস্ময় একটি এবং রতি, শোক ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথায় কাব্যরসের মূল জোগানদার হলেও বিস্ময়বোধ কাব্যচেতনার জন্য মূলতঃ দায়ী একথা অনেকেই অস্বীকার করবেন না হয়ত।[4] এক সময় বাংলাদেশে কবি ছিলেন কথক ঠাকুর। বৈষ্ণব কাব্যের পরবর্তী অংশ তো শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী

১ Theodore Watts Dunton যাকে renaissance of wonder বলেছেন।

২ There is plenty of mystery in poetry without making it mystical.

৩ সঞ্চারীভাবের সংখ্যা ৩৩ এবং প্রাণীর জন্মমুহূর্তের পর থেকে পারিপার্শ্বিক প্রভাববশতঃ ক্রমশঃই এগুলো তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে।

৪ এ প্রসঙ্গে কালিদাসের কাব্যের প্রসাদগুণ বর্ণনায় কীথের মন্তব্য স্মরণীয়: What he would have claimed merit for was his power of evoking by the brilliance of his description the sentiments of love, both as realised in union and as made poignant by separation, of pathos, of heroism, and, last but not least for Indian taste, of the *wonderful*. (Keith, A. B, Classical Sanskrit Literature).

সাহিত্যেই ভরপুর এবং সে সময় ভক্ত কবিরা তাঁদের রচনাবলী নানাস্থানে বৈষ্ণবদের উৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করে রসিকজনকে শোনাতেন। অর্থাৎ কবিরাও গান জানতেন, ভালো বক্তা ছিলেন, কিছুটা অভিনেতাও বটে। তার ওপর যার সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ তিনি আসর জমিয়ে ফেলতেন সহজেই। তৎকালে সে-কারণেই কাব্যে যে বৃহৎ ধারা বয়ে চলেছিল তার সঙ্গে বিশুদ্ধ কাব্যরসের আশেপাশে অনেক মালমশলা থাকতো যা ঠিক প্রকৃত কবিচিত্তকে স্ফূর্তি দিতে সক্ষম হত না। তবে কাব্য যেহেতু গোপনে নিরালায় আস্বাদন করবার প্রয়োজন হত না সেহেতু তথাকথিত কাহিনীকাব্য বা জীবনীকাব্যে তা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকত না। অবশ্য লিরিক কবিতার কথা স্বতন্ত্র। সেখানে এই বিস্ময়বোধ প্রথমাবধি লক্ষ্য করবার, এমনকি শ্রীরাধার চরিত্রচিত্রণেও তার প্রমাণ মিলবে নানাস্থানে নানা কবির রচনায়।

২

রসতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যে ধ্বনিবাদকে যদি উপক্রমণিকা বলা যায় বক্রোক্তিবাদকে উপসংহার বলতে সুধীজনের আপত্তি থাকবে না এবং কুন্তক যদিও মনে করেছিলেন তার এবম্বিধ কাব্যবিচার স্বীকৃত মতবাদের খণ্ডনমাত্র তাহলে তিনি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। কেননা, বক্রোক্তি-জীবিত-কার কাব্যে রচনাশৈলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরালেন। এবং দু'টি চিন্তাধারার মধ্যে এই সাযুজ্য যদি না থাকত তবে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পরবর্তী রচনা হয়ত অনুরূপ প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হত। তিনি নিজে (জগন্নাথ) সুকবি ছিলেন বলেই হয়ত বা পূর্ববর্তী সকল ব্যাখ্যাতার মধ্যে একটি সহজ সুন্দর যোগসূত্র আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন, নচেৎ তার প্রচেষ্টাও অন্ধকার যুগে এসে মিলিয়ে যেত, পুনরুদ্ধার হ'ত না।

শিশুকে কেন ভালো লাগে তার উত্তর দিতে গেলে নানাবিধ প্রশ্ন এসে পড়ে, কিন্তু একটি উত্তর বোধহয় সকল প্রশ্নের সমাধান যে প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষের মধ্যেও একটি করে শিশু বর্তমান। আমরা যে জ্ঞানবৃদ্ধ হবার পরেও মাঝে মাঝে সহজ সৌকুমার্যে মেলামেশা করতে পারি তার কারণ হয়ত এই যে শিশুর মতো বিস্মিত হতে জানি। কারণে অকারণে পুলক জাগলে খুশীর ঝর্ণায় নিজেকে কখনো সখনো ডুবিয়ে দিতে পারি, আষাঢ়ের ঘনঘটায় প্রথম

বর্ষা নামলে চাতকের মত ভিজতে জানি; এমন মৌল একটি চেতনাবোধ আমাদের এই চারিদিককার পৃথিবী সম্পর্কে সদাজাগ্রত করে রেখেছে। অর্থাৎ এই বিস্মিত হতে পারার মধ্যে যেমন কাব্যসৃষ্টির অঙ্কুর রয়েছে তেমনি কাব্য-রচনার কৌশল আয়ত্ত করার মধ্যেও এই অনুভব পরোক্ষে কাজ করে আসছে। বক্রোক্তির ব্যাখ্যায় রচনাশৈলীর প্রতি যে ইঙ্গিত রয়েছে তা ধ্বনিবাদকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, বরং বিভিন্ন স্থায়ীভাবের সঙ্গে এই দুটি তত্ত্বের একই যোগে। সুতরাং রচনাশৈলীর ভিত্তিতেই ব্যঙ্গ্য প্রতিষ্ঠিত যেখানে বিস্ময়বোধ তাদের উভয়েরই মঙ্গলাচরণ।

অতএব উনিশ শতকে যে রোমান্টিসিজ্‌ম এদেশে এলো তার প্রাথমিক ব্যাখ্যা হিসেবে এই বিস্ময়বোধকে মেনে নিলে বাংলা কাব্যের ঋতুবদলকে আর অস্বাভাবিক ঠেকবে না। কেননা, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে, আমরা একেবারেই সারা পৃথিবীর সদর দরজায় পৌঁছে গেলুম এবং এর ফলেই নতুন করে নিজেদের জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই বিস্ময়ের ঘোর আমাদের দীর্ঘদিন কাটেনি। ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়েও বৃহত্তর সমাজমানসের ওপর এর প্রভাব শুধু দীর্ঘস্থায়ী নয়, যুগান্তকারী হয়েছিল বলেই বিদ্বৎজনের বিশ্বাস। সে সময় কাব্যের অন্তর্নিহিত সুর যেমন বদলালো, রুচি যেমন মার্জিত হোল (তরজা, হাফ্‌ আখরাই এর আবেদন রসিকজনের কাছে তেমন করে পৌঁছুল না) তেমনি রচনাশৈলীর মধ্যে শব্দ ব্যবহারে প্রযত্ন দেখা দিলো, শব্দের যে বিশেষ অর্থবহতা রয়েছে তা যেন ক্রমশঃই কবিরা নতুন করে বুঝতে সুরু করলেন। পরবর্তীযুগে যারা গান লিখলেন, যেমন অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত, তারা গানই লিখলেন, কবিতা গানে মিশিয়ে ফেললেন না। এবং রাগ তাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েই, নিজেরা সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে অধিকার অর্জন করেই বাংলা গানের সাধনা করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ধর্মসঙ্গীত লিখলেন, কবিতা লিখতে গিয়ে নয়, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার গান গাইবার জন্যই আর রাগরাগিণীর সুর দিলেন অবিকৃত, কেননা, রাগরূপের গাম্ভীর্য তাতে বজায় থাকবে বলেই। অর্থাৎ কবিতা আর গানে যোগ রইলেও তারা স্বতন্ত্র রাস্তায় চলতে থাকলো এবং এখন থেকে কবিদের এই যুগ্ম দায়িত্ব যেন শেষ হয়ে গেল।

কবিতার আত্মায় যদি কোন পরিবর্তন সম্ভব হয়ে থাকে তবে তার কাব্য-

শরীরেও সে চিহ্ন বর্তাবে আর ভেতর থেকে যদি মনে হয়ে থাকে উপরিউক্ত বর্ণনাই সেজন্ত দায়ী তবে বাইরের পরিবর্তনের জন্ত আরো কয়েকটি, যুগধর্ম অনুযায়ী, সঙ্গত কারণ রয়ে গিয়ে থাকবে। ছাপাখানা না থাকায় পুঁথির মাধ্যমেই যেমন কাব্যসাহিত্য টিঁকে থাকতো এবং যেহেতু কাব্যসাহিত্য দশজনের পড়বার জন্তই লেখা হোত, সেহেতু কবিকে কথক ঠাকুরের ভূমিকা গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। প্রচার ছাড়া, সমালোচনা ব্যতিরেকে শিল্পচর্চা জিইয়ে রাখা সহজসাধ্য নয়। শিল্পীর নিজের তাগিদেই তার সৃষ্টি দেশগাঁয়ের লোক জানতে পেতো। দূর দূরান্তের লোক জমায়েত হোত ; এক আসর ভেঙে গেলে অন্তত্র আসর বসতো। আর শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, জেলে বেদে কামার কুমোর সবাই বসে কেনই বা শুনবে কাব্যপাঠ যদি না তাতে সুর তালের রকমফের থাকে, যদি না অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারসাজি থাকে, যদি না কাহিনীর স্বাদ পাওয়া যায়। তাই এ যুগে হাজার লোকে আর কাব্য শুনতে পায় না। মুষ্টিমেয় দু'চারজন, যারা বিশেষ করেই সূক্ষ্ম বোধ অর্জন করেছেন তারা, আধুনিক কাব্যকলার ভক্ত পাঠক—কেননা এখনকার কবিতা সাধারণের সহজ আবেদন থেকে বহুদূরে সরে এসেছে, নিজেদের ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা এবং তার প্রকাশভঙ্গির অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য কাব্যরসিককেই আকর্ষণ করতে পারবে, এ গ্রাম সে গ্রামের কামার কুমোরকে নয়। এজন্য আমাদের, একালের কবিদের দুঃখ করবার নেই, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তার কাব্যের পাঠকও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাচালী লেখকের শ্রোতৃবৃন্দের চেয়ে সংখ্যায় নগণ্য ছিল।

৩

শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা সর্বদেশে সর্বকালে ইতরবিশেষ হলেও উৎপত্তিগত মৌলিক কারণ প্রায় এক বলেই ধারণা হয়। সমাজব্যবস্থার রকমফের হওয়াতে, বিশেষ দেশকালের প্রেক্ষিতে শিল্পসৃষ্টির ধারা, বিষয় ও আঙ্গিকে, মোড় ঘুরতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ হরফ ব্যবহার করতে শিখলো যেহেতু ছবি ও গানের পর, সেহেতু শিল্পধারণার প্রাথমিক হাতমক্স কাব্যরচনার সময় তাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। এবং কবিতাও, আবার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার প্রপিতামহ বলেই, মানব সভ্যতা ও তার জীবনচর্চার কৌলিন্তবোধকে প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ হয়নি। প্রবৃত্তির সাহসী বিকাশ, তার অন্তর্মুখীন দ্বন্দ্ব ও বিশ্ববিধানের

আপাতঃ নির্মমতা কাব্যের বিষয়বস্তু হওয়ায় মানুষের প্রাণশক্তির ধারণা স্বতঃসিদ্ধবৎ প্রমাণিত। বাংলা দেশে যদি ধর্ম আন্দোলনের, ভগবৎভক্তির ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে চিত্তবিকাশের রাস্তা তৈরী হয়ে থাকে, ইংলণ্ডের কাব্যাকাশে দুর্দমনীয় প্রকৃতির সংঘাত, উত্তর সমুদ্রের উন্মত্ততায় সাগরপারের অধিবাসীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার স্বাক্ষর রয়েছে এ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যের ভেতরে, এমনকি তার পরবর্তীকালের কবিতাতেও। তাতে যে লিরিকের সুর বাজছে তাও যেন এক ঘন গম্ভীর ট্রাজিক পরিবেশে কঠিন ও শীতল। টটেল্‌স্‌ মিসেলেনী[৫] (১৫৫৭) থেকে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল তার অনুধাবণ প্রমাণ করবে, বাংলা কাব্যের গীতিমুখরতা থেকে এ কাব্য স্বতন্ত্র। এ প্রেম মান অভিমান বিরহ মিলনের কাঠামোয় তৈরী নয়। অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুরতা প্রেমের পরীক্ষার কষ্টিপাথর; তাই এই লিরিকধর্মী কবিতাতে গানের সুর সংযোজিত হল না[৬], মানুষের চিরকালীন বিয়োগ ব্যথাই একে অন্তরের মণিকোঠায় স্থান করে দিল। বাংলা কাব্যের ধারা সেক্ষেত্রে অঙ্কপথ পরিক্রমায় স্বষ্টশীল। হৃদয়বৃত্তি নিয়তিবাদের কূট ও নির্দয় চক্রান্তে পড়েনি,

৫ Shall I thus ever long, and be no whit the neare ?
And shall I still complain to thee, the which me will not hear ?
Alas ! say nay ! and be no more so dumb,
But open thou thy manly mouth and say that thou wilt come.
Whereby my heart may think, although I see not thee,
That thou wilt come—thy word so sware—if thou a live man be.
The roaring hugy waves they threaten my poor ghost,
And toss thee up and down the seas in danger to be lost......
(To her sea-faring lover)

৬ ইয়োরোপীয় সাহিত্য সাধারণভাবে দ্বাদশ শতাব্দীতেই বেশ গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে গানের উপাদান ছিল না এমন নয়। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে গান গাইতেন ত্রুবাদুররা, ভবিষ্যৎ কাল যদিও তাদের কোন খোঁজ রাখেনি। ফরাসী দেশের এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল : The vernacular literature of the twelveth century was not designed for reading. The epic poems were composed for recitation to the simple music of a primitive fiddle, and the lyrics for singing to more complicated tunes, sometimes with refrains, or as a voice and fiddle accompaniment to a dance (J. M. Cohen : A History of Western Literature)। অবশ্য ইংরেজী বা ফরাসী কবিতার এ পর্যায়

বাইরে থেকে কেউ তাকে এমন আঘাতের পীড়নে শ্রান্ত করেনি, অতএব তার রস শান্ত, কণ্ঠ স্নিগ্ধ, স্বল্পোচ্চারিত। গান সেখানে সহজেই নিজের রাস্তা করে নেয়। সুর তার আপন সীমানায় এসে কাব্যকে নিজের নাগপাশে চিরকালের বন্দিনী করে রাখে।

ইংরেজী কাব্যের এই বাস্তবমুখীন ধারার সঙ্গে ট্রাজিক সুরের মিলনেই পরবর্তীকালে যে রোমান্টিকবাদের জন্ম হয়েছে তার সঙ্গে বাংলা কাব্যের কি লৌকিক কি গীতিকাব্যের কোন যোগ ছিল না। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে নতুন শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা এ দেশের মাটীতে নতুন ফসল ঘরে তুললো তার স্বাক্ষর রয়েছে আধুনিক কবিতায় প্রধান পুরোহিত যার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

সেই থেকে কবিতা ও গানের রাস্তা পৃথক হয়ে গেল এবং আসর জমিয়ে কাব্যপাঠও আর শোনা গেল না। তবে কি এই ধারার শেষ হয়ে গেল বিংশ শতাব্দীতে এসে? ইংলণ্ডে কাব্যনাট্যের নতুন যে জোয়ার এসেছে, এলিয়টের Murder in the Cathedral রঙ্গমঞ্চে যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে, ক্রিষ্টফার ফ্রাই এর নাটক-অভিনয়ে তিলধারণের যে স্থান থাকে না, তাতে তরুণ কবিকুল প্রভূত উৎসাহ বোধ করছেন। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথই আবার এ পথেরও প্রথম পথিক। তবে তার বেশীর ভাগ রচনাই 'নৃত্যগীতবাদ্য'

রেণেশাঁসের পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইটালীয় রেণেশাঁসের যোগসূত্র ছিল সিসিলি এবং তৎকালীন ওই দ্বীপটির শাসক জার্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিশ, তার রাজদরবারে নানা সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। ইটালীয় কবিতার সূত্রপাত এখানেই এবং রচনাশৈলী নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার ফলস্বরূপ যে বিপ্লব হল তার প্রথম নিদর্শন, সুরের ইন্দ্রজাল থেকে কাব্যের মুক্তিলাভ। অর্থাৎ এতকাল কবিতা গানেরই অঙ্গীভূত ছিল—চারণ কবিরা দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াতেন। এখন থেকে কবিতা নিজস্ব ধ্বনি, ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের পরই নির্ভরশীল রইলো:

Henceforth a *chanson* or *canzone*, despite its name, was not a piece composed for singing, but merely a poem which followed a pattern originally invented for that purpose. (ibid)

সহযোগে অভিনীত হয়েছে। সেখানে কাব্যাংশ মুখ্য নয়; এবং অভিনীত হবার জন্যই কবিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কোন একটি বিশেষ নাটকীয় পরিবেশ ও ঘটনার প্রস্তুতিতে কিছু কিছু কবিতা লেখা হচ্ছে। কিন্তু বাংলা কবিতায় অন্তত: এ নিতান্তই হালের পরীক্ষা। ভবিষ্যৎ এর অনিশ্চিত; কিন্তু যেহেতু সৃষ্টিশীল মানুষ নিজের সৃষ্টিকেই কালেদিনে বর্জন করতে দ্বিধা করেনি এবং নতুনের সন্ধানে ঘর ছেড়েছে সেহেতু, এদিকেও এই পথ-পরিক্রমা বাংলা কাব্যকে একটি বিশেষ গতিবেগ দান করবে, এ আশা অবাস্তব নয়। সামবেদ অথবা গায়ত্রী স্তোত্র[৭] সুর করে পাঠ করা হতো, তার উচ্চারণ গাম্ভীর্য, ধ্বনির উৎকর্ষ ও ভাব তন্ময়তায় কাব্যপাঠ এক আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হত। বিশেষতঃ স্তোত্রপাঠ এবং invocation এ ফারাক নামমাত্র। বুক অব্ সাম্স্ পড়তে গেলেও অনুরূপ অনুভূতি মনকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সে-কবিতা কি আর লেখা সম্ভব? মানুষ যেমন তার পরিবেশ তৈরী করায় কৃতসংকল্প তেমনি পুরোনো পরিবেশকে ভাঙতেও তার দ্বিধা নেই। ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সমস্তই এক সময়ে তার কাছে বৃহৎ জীবনধর্মের অঙ্গীভূত ছিল এবং পরবর্তীকালে হয়ত উক্ত ক্রিয়াকলাপই তার মুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকে নতুন পথ করে নিতে হয়েছে। শিল্পসৃষ্টিরও তেমনিধারা নিজস্ব একটি নিয়ম আছে এবং এই বৃহৎ মানবচৈতন্যের সমান্তরাল পথে তাকে চলতে হয়েছে। অধুনা কাব্যরচনায় প্রাচীন কালের কবিতার স্বাদ ও বর্ণনা যদি না মেলে তাতে কাব্যের গতিশীলতারই প্রমাণ মিলবে। বরং সামবেদের মত আকাশ বনানী প্রতিধ্বনিত করে নিষাদ ঋষভ আন্দোলনে স্তোত্রপাঠ

৭ ভারতীয় সঙ্গীতের আদিপর্ব সামগান। প্রথমে একটি, পরে দুটি ও তিনটি সুরের প্রয়োগে সামগান গাওয়া হোত। সার্ত স্বরের প্রচলন বহুপরের বিবর্তন স্বরূপ; অনন্ত সঙ্গীতে তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা প্রভৃতি বাইশটি শ্রুতির ব্যবহার রয়েছে। বস্তুতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি এই শ্রুতির যথোচিত ব্যবহারের উপর। তথাপি, মুখ্যতঃ তিনটি সুরের আন্দোলনে যে সামস্তোত্র পাঠ করা হোত তার আবেদনও কম ছিল না। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'তে এরূপ স্তোত্রের স্বরলিপির উল্লেখ করেছেন। The Mode of singing Sama Gana প্রবন্ধে যে স্বরলিপি মুদ্রিত আছে তার কয়েকটি উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত।

না হলেও একালের কবিতা মুষ্টিমেয় রসিকচিত্তকে আনন্দ দানে অসমর্থ হবে না।

[প্রবন্ধে কয়েক স্থানে মধ্যযুগ ও তার পরবর্তীকালের কবিতা প্রসঙ্গে 'আবৃত্তি' কথাটির উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর মত অনুযায়ী 'আবৃত্তি'র কৌশলটি পুরোপুরি ইংরেজ প্রভাবজনিত; আমাদের কবিতা রীতিমত গানের সুরেই গাওয়া হোত এবং তা বাদ্যযন্ত্র সহযোগেই। আমি, অন্যপক্ষে, গীতরূপ তাকেই আখ্যা দিতে চাইছি যার মধ্যে সুরের আরোহ-অবরোহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিতে ব্যবহৃত হোত, পাঁচালী পাঠের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি (যা মাত্র দুটি তিনটি সুরের সামান্য ওঠানামার ওপর নির্ভর করত) তাতে থাকত না; বরং প্রকৃত সঙ্গীতরূপের মাধ্যমেই যার সহজ প্রকাশ লক্ষণীয়।]

গায়ত্রী মন্ত্রটি দেওয়া গেল:

ও ৎ ত ম্। ত ৎ স বি তু র্ব রে ণি য়ো ঃ ম্।
সা — নী রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে — রে
ভা র্গো দে ব স্য ধী ম হী ঃ।
রে - রে - রে - রে - রে - রে - রে - সা —
ধি য়ো য়ো নঃ প্র চো ১ ২ ১ ২। হিম্
সা রে - রে - রে রে সা - রে-সা-রেঁ সা রে রে রে
আ ২। দায়ো।
সা - রে-রে ইত্যাদি

অবশ্য যিনি যজ্ঞকালে সামগান গাইতেন তাকে 'প্রস্তোতা' (কবি নন) ও তার গানকে 'প্রস্তাব' (কবিতা নয়) বলা হত, যদিও অন্য একটি স্তোত্রে 'কবিসম্রাজম্' এমন উল্লেখ পাওয়া যায়।

যদি অভিজাত সাহিত্য বলতে বৈষ্ণব কবিকুলের অথবা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে বুঝি অথবা লৌকিক কাব্য বলতে মনসার গান, পাঁচালী, ছড়ার কথাই মনে হয় তবে যে প্রভেদ স্বতঃই আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা শুধুমাত্র মৌলিক নয়, বরং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যে 'অভিজাত' কথাটির ব্যবহার স্বল্প, তবু প্রয়োগ করতে বাধা নেই কেননা লৌকিক কাব্য থেকে তার স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুমেয়। 'অভিজাত' কথাটি বৃহৎ অর্থে ইংরেজী 'ক্ল্যাসিক্যাল' কথার পরিপূরক বলে মনে হতে পারে। যে কাব্যে বা সাহিত্যে মননশীলতাই মূল আশ্রয় অথবা গভীর ভক্তিবাদ, তার রসাস্বাদনে চিরন্তন আবেদন থাকবে—একথাই স্বতঃসিদ্ধ। সে তুলনায় লৌকিক কাব্য-সাহিত্য সীমাবদ্ধ। বরঞ্চ দেশজ সংস্কার. ক্রিয়াকলাপ, পালপার্বণ ও ঘরকন্নার অজস্র উপকরণেই এর বৈচিত্র্য। রস আস্বাদনের রাস্তাও পৃথক, অধিকারীভেদে এর আকর্ষণ। তবু লৌকিক সাহিত্যের আবেদনও কম নয়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের, বারমাস্যার কথা যেমন লৌকিক সাহিত্যের বিশিষ্ট উপাদান তেমনি ছড়া, গাথা, ব্রতকথা—নানা নিত্য প্রয়োজনীয় আচার আচরণ রীতিনীতি বিষয়ক কাহিনীও এই সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েছে। সেদিক থেকে এর রসাস্বাদনেও যে চিরন্তন আবেদন রয়েছে, সাধারণ মানুষের অন্দরমহলে যে এর একটা সহজ প্রবেশাধিকার রয়েছে একথাও স্বীকার করতে বাধা নেই। অভিজাত সাহিত্যের উৎকর্ষ তার মননশীলতায়, রচনাকৌশল ও প্রয়োগরীতির চাতুর্যে, চিন্তাধারায় অভিনবত্বে—অন্যদিকে লোকসাহিত্যের প্রধান পুঁজি হোল সাধারণ মানুষের জীবনকথা। মানবিকতার সহজ স্ফূর্তিতে এর প্রাণবত্তা। এই সাহিত্যে চরিতকথন আছে, ঝগড়া বিবাদ, মিলন বিরহ, স্নেহ প্রেম, ঈর্ষা দ্বেষ বিভিন্ন রকমের মানবিক প্রবৃত্তি, ঐহিক সুখসমৃদ্ধির ছবি যেন আলপনার মত চিত্রিত করা হয়েছে। অনেক সময়েই আমাদের মত সহরবাসীর মনকে এ সাহিত্য গভীরভাবে নাড়া দেয়। তবু এও অবশ্যম্ভাবী যে লোকসাহিত্য আর নতুন করে রচনা করা হবে না—ধীরে ধীরে এ সাহিত্য নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই এগুতে থাকবে।

আদিম সমাজব্যবস্থার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিল্পকলা সাহিত্য ও সঙ্গীতও যে একদিন মানুষ বিস্মৃত হবে এ কিছু আশ্চর্য নয়। বহু সমালোচক মনীষী বিশেষ করে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের আশংকা রয়ে গেছে যে আদিবাসীদের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের লোকশিল্প ক্রমশঃই বিস্মরণের পথেই এগুচ্ছে। কেউ কেউ এমন প্রস্তাব করেছেন যে এঁদের সমাজ-ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখা প্রয়োজন নচেৎ অতীত সভ্যতা থেকে বর্তমান সভ্যতার সূক্ষ্ম যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোকসাহিত্যই সংহত সমাজবদ্ধ মানুষের প্রথম শিল্প সৌন্দর্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৃষ্টিকর্ম। শুধুমাত্র সাহিত্য কেন, সঙ্গীত ও নানাবিধ শিল্পকলা ও কারুকার্য মণ্ডিত নক্সা, আল্‌পনা ইত্যাদি তাঁদের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক। এখনো পর্যন্ত অভিজাত শিল্পসাহিত্যকর্মকে ও শিল্পসাহিত্য রসিক ব্যক্তিকে যে নানা সময়ে লোকসংস্কৃতি প্রভাবান্বিত করে মূলতঃ তা এর অন্তর্নিহিত সার্বজনীন আবেদনরই ফলস্বরূপ। সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা যতই অগ্রসর হয়েছে, মানবচিত্ত ক্রমশঃই নাগরিক সভ্যতার বিরাট কর্মকেন্দ্রে নিজেকে নিয়োগ করেছে। এর সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে আজকে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

লোকসাহিত্যের বেশীর ভাগ রচনা যেহেতু অতি প্রাচীনকালের, তার মাধ্যম তাই ছন্দোবদ্ধ কবিতায়, গানে বা অনুরূপ সুবিন্যস্ত ছড়ায়। কাব্যপ্রাণ বাঙালী জাতি নানাভাবেই এ-সাহিত্যকে ধরে রেখেছে, বিলাসের অথবা সখের উপকরণ হিসেবে নয়, দৈনন্দিন জীবনধারায় তাকে একটি সহজ আত্মিক গ্রন্থিতে বেঁধে রেখে। সুদৃঢ় সমাজবন্ধনের ফলস্বরূপ যে সামগ্রিক বোধ জাগ্রত হয় তারই সৌন্দর্যানুভূতি থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে বা প্রয়োজনানুভূতি থেকে এদের জন্ম। একটি সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ, আলাপ আলোচনা, দোষত্রুটি, ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে লোকসাহিত্যে; সুতরাং একথা সহজেই স্বীকার করা যেতে পারে, শুধুমাত্র রসাস্বাদনই নয়, জাতি এবং সমাজের সবিশেষ জ্ঞান, তার ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি নির্ণয় এবং বৃহত্তর সমাজগঠন ও পরিবর্তনের যৌন কারণগুলি সম্পর্কেও লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন অত্যাবশ্যক বলেই মনে করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে লোকসাহিত্যে বুদ্ধিপ্রবণতা নেই, জ্ঞানমার্গের দুরূহ

চিন্তারাশিও সেখানে স্থান পায়নি অথচ অনেক আউল বাউল ফকিরের মুখে মুখে যে সব তত্ত্বকথা প্রচারিত হয়েছে তা বহু মনীষীদেরও বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' নামক পুস্তকে এরকম কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন—দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতটি যেমন 'উইড়া গেল রাজহংস পইড়া রইল ছাওয়া' অথবা আর একটি তত্ত্বসঙ্গীত যেমন—

'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে,
আমি আর বাইতাম পারতাম না'—

এবং এরকম অসংখ্য সুন্দর সুন্দর চরণ মাঠে ঘাটেই অথবা গাছতলায় শুনতে পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলছেন : 'যেখানে উচ্চতর সাহিত্য ও শিল্পবোধ লোক-সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, কেবলমাত্র সেখানেই বাংলা প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে রূপকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ রূপকের ব্যবহার একটি উচ্চতর শিল্পবোধ হইতেই জাত—সহজ ও সরল জীবনের মধ্যে ইহার প্রেরণা আসিতে পারে না।" আবার যেখানে উপমার প্রয়োগ পাওয়া যায়—নাথগীতিকায় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসযাত্রার সময়ে রাণীর আকুতি :

তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙা চরণ বেড়িয়া রমু পলাইয়া যাবু কোথা॥

অথবা অন্যত্র, মহুয়া পালাটিতে নদ্যার ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে মহুয়ার করুণ জীবন-ইতিহাস বর্ণনা :

নাই আমার মাতাপিতা গর্ভসোদর ভাই।
সোতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥

এ সমস্ত স্থানেও একথাই মনে হয় লোকসাহিত্য নিরক্ষর পল্লীকবিদের রচনা হলেও তাঁরা স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত কবিমানস ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন। সাধারণ লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত বলেই অথবা সুগভীর পাণ্ডিত্যের অভাব হেতুই যে তাদের কবিক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি কিছু কম ছিল এমন নয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা যে অনেক সময়েই কবিক্ষমতাকে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকা সুকৌশলে যে ভাবে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা যথার্থ সৃষ্টির সহায়ক, যে কোন দেশের সাহিত্যের সার্থক রূপায়ণ। দেখা যাবে লৌকিক

ধাঁধাগুলি যা বহুকাল থেকে লোকমুখেই প্রচারিত হয়ে আসছে তা কতদূর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি-সঞ্জাত। সুতরাং এ কথা মনে করা সঙ্গত নয় যে লৌকিক সাহিত্যের রচয়িতাগণ নিরক্ষর ছিলেন। একথা কি আমরা জানি না, যে-সব কবিয়াল এখনো জীবিত আছেন দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্যে তাঁদের কি গভীর জ্ঞান! হয়ত তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান কালের রুচিসম্মত নয়, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত, পুরাণের কাহিনী, ভাগবত, বৈষ্ণবকাব্য ও মঙ্গল ও শাক্ত কাব্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এমন কি সাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যের এই দীর্ঘ রাজপথে তাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আমাদের অনেকেরই লজ্জার কারণস্বরূপ।

অবশ্য একথা স্বীকার্য তাদের সৃষ্ট কাব্যে সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্তি মৌলিক চিন্তাধারার চেয়ে আবেগপ্রবণ হৃদয়ানুভূতিই বেশী প্রবল ও কার্যকরী। বিচ্ছেদের সুগভীর বেদনা, চোখের জলে জাগর রাত্রির দীর্ঘ প্রলম্বিত ক্ষণ, প্রিয়তম বন্ধু স্বামী, পুত্রের নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা, সংসারের নিরন্তর দুঃখ যন্ত্রণা, রাজা অথবা কাজীর অত্যাচারে ক্লিষ্ট প্রজার বিবরণ, দুর্ভিক্ষে অনাহারে অনাবৃষ্টিতে পরিণত শ্মশান ভূমির উপর বুঝিবা মৃত আত্মার পদচারণা, ধর্মঠাকুরের শিবঠাকুরের অনাবশ্যক ক্রোধ—এই সব কাহিনীর অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন সমবেদনা তার তুলনা কোথায়! বাংলা কাব্যসাহিত্যের মূল যে কটি শাখা আছে তার লৌকিক শাখাই প্রকৃত মানবসমাজের ঐহিক দিকটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারা উচ্চমার্গের চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে আশ্রয় করেই পুষ্ট হয়েছে—যদি ধরা যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান নিছকই রূপক তাহলে সে-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের যোগ নেই বলেই ধরা যেতে পারে। ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতাই এখানে বড় কথা; ভক্তিবাদ ও বিশেষ করে চৈতন্য-জীবনীসাহিত্যে প্রেম-ভক্তির জোয়ারে যেন বাংলা দেশের প্রকৃত ছবিটি মুছে গিয়ে কোন এক লোকোত্তর, এমনকি অপ্রাকৃত জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের চিরন্তন মূল্য বিচারে এর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও একান্ত বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলিত চিত্র এতে পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য চৈতন্যদেব বাঙালীর ঘরের ছেলে এবং শচীমাতা আমাদের বাংলাদেশেরই সার্বজনীন মাতৃরূপে বহুক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এর আবেদন পরম জ্ঞানের, পরম ভক্তির, পরম

ত্যাগের। সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনের আশা আকাঙ্খাকে এই সাহিত্য ফুটিয়ে তোলেনি এবং মনে হয়, অনেকটা সে কারণেই বৈষ্ণব কাব্য বা সাহিত্য চিরদিনই একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছেই সমাদৃত হয়ে এসেছে। ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তার আবেদন ততটা পৌঁছোয়নি যদিচ বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ গতিপথে বৈষ্ণবকাব্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভবিষ্যৎ কালেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতগুলিকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা গেলে এগুলিকেও অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির রচনা মনে করবার কারণ নেই। বৈষ্ণবকাব্যের সুগভীর তত্ত্ব আমাদের চিন্তালোকে যেমন সাড়া জাগিয়েছে দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতগুলিও এদের আবেদনে একটি সুউচ্চ ভাবধারার সন্ধান দিয়েছে। যে শিক্ষা থাকলে প্রকৃতি, মানব সমাজ ও আরো গভীর তত্ত্ববিষয়ক কাব্য রচনা সহজায়ত্ত, যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব, যে অনুভূতির 'পর, সমবেদনার 'পর কাব্য সাহিত্যের কাঠামো দণ্ডায়মান সে সমস্ত গুণাবলীই এঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতেও সত্যকার দেহের স্বীকৃতি ছিল না, মনই সেখানে প্রকৃত আসন দখল করেছিল। রূপকের ব্যবহারে উপমার বাহুল্যে কাব্যশরীর অলঙ্কৃত হলেও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভোগবিলাসের কথা উচ্চারণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি।

২

এ প্রসঙ্গেই লোকসাহিত্যের রূপরসের আলোচনা যুক্তিযুক্ত হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি আশুতোষ ভট্টাচার্যের বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও পরিশ্রমের ফল। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচনা এবং 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' সংকলন ও সম্পাদনা করে তিনি বাংলাদেশের সুধী সমাজের কাছে এবিষয়ে তাঁর যোগ্যতা বহুপূর্বেই প্রমাণ করেছেন। যাঁরা লোকসংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ জানবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাছে এ অজ্ঞাত নয় যে কি দুস্তর বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এ কাজে ব্রতী হতে হয়। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি নাগরিক সভ্যতার দুর্বিসহ একঘেয়েমিতে বহু সুধীজন উত্যক্ত হয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন—ফলতঃ বহু সহরবাসী নিজেরাই লোকসংস্কৃতির ধারকবাহক হয়ে নানারকম বিকৃত ও মিশ্র শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত

সহরের হাটেবাজারে পরিবেশন করছেন। শ্রী ভট্টাচার্যই সম্প্রতি এমন একটি নজির আমার কাছে উপস্থিত করেছিলেন এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমার এ অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে এখনো বহুস্থানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা প্রাক্তন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখলেও কিছু কিছু মিশ্রণ আরম্ভ হয়েছে। এর কারণও সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞান-শাসিত যুগে সুদূর পল্লীগ্রামও আজ সহরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বীরভূমের নিভৃত পল্লী পথে পথে যে বাউল ঘুরে বেড়ায় সেও আজ সহরের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেনি, সারিগানের নৌকায় মাঝিমাল্লাদের হয়ত কার্যোপলক্ষেই সহরে বাসা বাঁধতে হয়েছে—অনবরতই এ মিশ্রণ চলছে। কিছু-দিন পূর্বেই কলকাতায় ফকির শ্রেণীর একটি অবাঙ্গালীর মুখে মারাঠী পদ শুনে-ছিলাম। তার বাণী কিছুই মনে নেই—লোকসঙ্গীতের উচ্চগ্রামে বাঁধা তীক্ষ্ণ সুরের সঙ্গেই আবার কানাড়া রাগের সুন্দর স্বরবিন্যাস তাতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ রতনঝংকারের মতে, মারাঠী পরিবারের শিশুদের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে, দেশী সঙ্গীতের মধ্যে সারং রাগের আভাষ স্পষ্টই পাওয়া যায়। সুতরাং লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, 'লোক-গীতি ও উচ্চতর গীতির মধ্যে একটি স্থূল পার্থক্য বিদ্যমান'—সে কথা পুরোপুরি সত্য নয়। উচ্চতর গীতি থেকে বিভিন্ন রাগের কাঠামো বহু সময়েই লোকসঙ্গীতের মধ্যে অবলীলাক্রমে এসে গেছে—পার্থক্য যা চোখে পড়েছে তা রসাস্বাদনে—সুরের দিক থেকে বহুলাংশেই একটি নিগূঢ় আত্মীয়তা চোখে পড়ে। আরো একটি বক্তব্য সম্পর্কে ঈষৎ মত-ভেদের আশঙ্কা আছে। 'লোকসঙ্গীতের প্রচলিত সুর দুঃসাধ্য অনুশীলনের বস্তু নহে, বরং স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই তাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। অতএব এই বিষয়ে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।' (পৃঃ ১৩০, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম সংস্করণ) শ্রীহট্ট জেলার বেহেলি গ্রামের প্রখ্যাত লোক-সঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর মুখে শুনেছি যথাযথভাবে লোকসঙ্গীতেরও অনুশীলন দরকার এবং সত্যকার গুণী সঙ্গীতশিল্পী নিষ্ঠা নিয়েই এর চর্চা করে থাকেন। বেশীর ভাগ লোকসঙ্গীতেই মন্দ্র-সপ্তকে কাজ একেবারেই নেই, মধ্য ও তার সপ্তকেই সুরের সঞ্চরণ বেশী এবং লোকসঙ্গীতের আরো একটি আকর্ষণী শক্তি এই যে যথাযথ শ্রুতির ব্যবহারে এমন আশ্চর্য ভাবরূপ প্রকাশ পায় যা ফুটিয়ে তোলা যথেষ্ট পরিশ্রম সাপেক্ষ। একথা খুবই স্বাভাবিক যে তাঁরা শুনে

শুনেই গান আয়ত্ত করেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও যে শ্রুতি বিদ্যা একথা তো প্রত্যেকেরই জানা আছে। দ্বিতীয়তঃ, গুরুবাদ সম্পর্কে লেখক যে কথা বলেছেন তারও অল্প-বিস্তর ব্যতিক্রম আছে। মুসলমানদের মধ্যে যে আউল সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সঙ্গীত-চর্চা গুরুমুখী হয়ে থাকে। গুরুকে 'মুরশিদ' এবং শিষ্যকে 'মুরিদ' বলে। তাছাড়া বাংশানুক্রমিক সঙ্গীতচর্চার কথাও অজানা নয়। পূর্ববঙ্গে 'বাউলা'দের সমবেত সঙ্গীত শেখবার পদ্ধতিও বংশগত ধারা মেনে চলে। তবে এ সমস্ত উদাহরণগুলি শুধুমাত্র সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই উল্লেখযোগ্য। নচেৎ লেখকের বিশ্লেষণ ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সবিশেষ গ্রহণযোগ্য।

এই পুস্তকের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় : লেখক কর্তৃক লোকসাহিত্যের সৃষ্টিমূলে আদিম জাতি উপজাতির প্রভাবের সরল স্বীকৃতি। নানাস্থানেই তিনি একথা বলেছেন, এমন কি 'মধ্য প্রদেশে গণ্ড উপজাতির সঙ্গীতে যা শুনিতে পাওয়া যায় তাহারই ভাব ও চিত্রটি বৈষ্ণব কবি এইভাবে রূপায়িত করিয়াছেন :

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর। ইত্যাদি'

আবার 'ইহা (কীর্তন) লোকসঙ্গীতের স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সঙ্গীতের স্তরে উন্নীত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা কোন আদিবাসীর লোকসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়াই যে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই।' অবশ্য এর প্রমাণ স্বরূপ লেখক কতগুলি উদাহরণ পাশাপাশি ধরে দিয়েছেন। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট! এমন দেখা গেছে দুটি বিভিন্ন দেশের দুটি কাহিনী প্রায় অনুরূপ অথচ পারস্পরিক প্রভাব পড়বার বিশেষ কোন ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক কারণ ঘটেনি—ট্রয়ের যুদ্ধের পটভূমিকা কি রামায়ণ কাহিনীর অনুরূপ নয়? প্যারিস কর্তৃক হেলেন এবং রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ অথবা দেবদেবীদের বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন ইত্যাদি ঘটনা থেকেই কি এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রামায়ণের কাহিনী হোমরকে অনুপ্রাণিত করেছিল? অথবা আমাদের লিঙ্গপূজা ও গ্রীকদের ফ্যালাস (Phallus) পূজা থেকেই কি অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়? দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতির যোগাযোগে যদি কখনো নতুন সংস্কৃতি জন্ম নেয় তবে তার মূলে শুধুমাত্র সহ-অবস্থানই একমাত্র

কারণ এমন মনে করা সঙ্গত নয়, বিশেষ করে ছড়া অথবা প্রবাদ বা ধাঁধার উৎপত্তিগত কারণ অনেকটা সামাজিক বা পারিবারিক চৌহদ্দির অন্তর্গত একটি বিশিষ্টতার ওপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে যা সহ-অবস্থানের চেয়েও বেশী কার্যকরী ও প্রবল তা হোল ভাবের আদান প্রদান, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। যাঁরা উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের মৌলিক প্রভেদ জানেন ও এই প্রভেদের কারণ সম্পর্কে সচেতন তাঁদের কাছে একথা অজ্ঞাত নয়। লেখকের বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগটি কীর্তনের উৎপত্তিবিষয়ক আলোচনা। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (দেশ। ২৪শে আষাঢ় ১৩৬২)। তিনি বলছেন, 'এ ধরণের গানকে বলা হ'ত কীর্তি, কীর্তন নয়। কীর্তন শব্দটা এই কীর্তি থেকেই এসেছে···শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় বলা হয়েছে' গোপীগণ কিভাবে তার কীর্তিগান করেছেন···'শ্রীচৈতন্য এই গানকে একটি বিশেষ রূপ দিলেন এবং তার সময় থেকেই কীর্তন কথাটি গুরুত্ব লাভ করেছে।' যাই হোক, কীর্তন গানের ধারা, রস ও আবেদন এবং তার ধ্রুপদী চালের অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে গায়ন পদ্ধতি যে কাঠামো আশ্রয় করে এতদিন সুধীসমাজে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেছে তা যে ওঁরাওদের একটি সামাজিক নৃত্যগীতি অনুষ্ঠান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এ ধারণা কিছুটা কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়। এখানে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য কিছুটা উপস্থিত করি। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, 'বিষ্ণুর নাম-গুণ-লীলা-শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে অর্পণ করিয়া তাঁহারই অনুষ্ঠান আমি পুরুষের উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।' অন্যান্য পুরাণেও কীর্তনের উল্লেখ আছে। 'বাংলায় কীর্তন একটি বিশেষ অর্থে অভিহিত হয়। কয়েকজন মিলিয়া নির্দিষ্ট সুরে তালে লয়ে গীত এক স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে শ্রীভগবানের নাম-গুণ লীলাত্মক যে গান, বাঙ্গালায় তাহাকেই কীর্তন বলে।' উচ্চাঙ্গের কীর্তনের সুরে রাগরাগিণীর প্রয়োগ এবং তালে ধ্রুপদ খ্যালের সঙ্গতের মতই অতীত, অনাঘাত, তেহাই, ফাঁক ও বিভিন্ন বোলের ব্যবহার আছে। বিশেষতঃ কীর্তন ভাবসঙ্গীত, গভীর রসের অনুভূতি ও মানবচিত্তের চিরন্তন ভক্তিভাবেরই একটি উচ্চতর প্রকাশ যার সঙ্গে তথাকথিত লৌকিক নৃত্যগীত-

বাক্যের মাধ্যমে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মৌলিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য বলেই সাধারণের নিকট বিবেচিত হবে।

ধাঁধার প্রচলনও প্রাচীন নয় এবং খুব আদিম সমাজে এর প্রচলন হওয়া অসম্ভব—এমনতর অনুমান 'বাংলার লোকসাহিত্য' বইটিতে পাওয়া যাচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, ধাঁধার মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায় তা পরিণত মানবমনেরই বিকাশ, কিন্তু এই বুদ্ধিবৃত্তির অভাব যে আদিম সমাজে ছিল তাও নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে যে-ভাষার প্রয়োগ ধাঁধাতে দেখা যায় সে-ভাষায় চাতুর্য আছে, অলঙ্করণ ও সূক্ষ্ম চিন্তার প্রকাশ রয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমন কি অপভ্রংশ বাংলায় 'প্রহেলিকা'র প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যও অবশ্য স্বীকার করেছেন 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধাঁধা বা হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ।'

বইটির সবচেয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে 'গীতিকা' অংশে। লেখক যে শুধুমাত্র সংগ্রাহক নন, সহৃদয় সমালোচক, শুধুমাত্র পণ্ডিত নন, রসবেত্তা এ কথার প্রমাণ বইখানির প্রায় সর্বত্রই পাওয়া গেছে। একথা স্বীকার করতে কোন কুণ্ঠা নেই, এরকম প্রয়োজনীয় সাহিত্যের ইতিহাস উপন্যাস-পাঠের আগ্রহ নিয়েই পাঠককে আগাগোড়া পড়ে যেতে হয় এবং শেষে বাংলা সাহিত্যের এই বিরাট লৌকিক শাখার বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক পরিধির সম্যক জ্ঞান লাভ করে যথেষ্ট উপকৃত হওয়া যায়। লৌকিক সাহিত্য যে অভিজাত সাহিত্যের পাশেই সমান আসন দাবী করতে পারে একথা পূর্ববঙ্গ অথবা পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি পড়বার পড়ে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই। গীতিকাগুলির প্রধান আকর্ষণ মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি 'প্রেম' বিষয়ক কাহিনীগুলি। এক একটি কাহিনী যেন মুক্তাবিন্দুর মত টলমল করে' আমাদের স্বপ্নলোকের মন্দির ঝালরে আজও ঝুলে রয়েছে। এর আবেদন সকল মানুষের; বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদেরও চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এমন অপরূপ কাব্যকলা সাহিত্যের ইতিহাসে সচরাচর মেলেনা। যখন বৈষ্ণবকাব্যের ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ভক্তিভাবের ঢেউ উঠেছিল তখনও বাংলা দেশের সাধারণ লোক এই লৌকিক কাব্যগাথার স্বাদ ভোলেনি। চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যমঙ্গলে এমনতর উল্লেখ রয়েছে যে

জনসাধারণের রুচি তখনও লৌকিক কাব্যের মাধ্যমেই গড়ে উঠতো, রামায়ণ কাহিনীর নানা লৌকিক প্রচলিত আখ্যানবস্তু, মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির কাহিনী ইত্যাদি বহু স্থানে নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হোত।

পরিশিষ্ট : বাংলা কাব্যে মানবিকতা

বাংলা কাব্যের প্রবহমান ধারায়, বিশেষতঃ লৌকিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে এবং সমান্তরাল হয়েই যে আদর্শবাদ নানা ধারায় প্রকাশ লাভ করেছে তা হচ্ছে মানবিকতা। মানবজীবনের সামাজিক দিকটির নানা পরিবর্তন হেতু সাহিত্যের কৌলিন্যও বজায় থাকেনি, বার বার তার দিগদর্শনীতে বিভিন্ন আলোছায়ার প্রতিচ্ছবি পড়েছে। প্রথমে বৈষ্ণব কাব্য, পরে মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং সর্বশেষে উনবিংশ শতকে নবযুগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে মানবিকতা দেখা দিয়েছে তার মূল সুর এক হলেও চিন্তার স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। বস্তুতঃ মঙ্গলকাব্যের মানবিকতা আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছে।

কাব্য নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মুখ্যতঃ মানবজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও, এর আবেদন সব সময় একই কেন্দ্রাভিমুখী হয়নি। অর্থাৎ জীবনদর্শন ভিন্ন হলে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু সাহিত্যের লক্ষ্য ভিন্নমুখী হতে বাধ্য। ফলস্বরূপ যুগে যুগে কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের অন্তরালে নানা ঘটনার স্বাক্ষর থাকে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিসঞ্জাত অভিজ্ঞতা যেমন প্রধানতঃ দায়ী, তেমনি পরোক্ষভাবে যুগ-চিন্তার প্রকাশ ও তজ্জনিত বিশেষ কোন মানবিক মূল্যবোধও সম-পরিমাণে দায়ী থাকে বলে মনে করা যেতে পারে। কোনও যুগমানব তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা একটি জাতির গভীর অন্তঃস্থলের কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হন, প্রজ্ঞা দ্বারা ভবিষ্যতের সর্বতোমুখী অগ্রগতির কথাও ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি অনুরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তার ভাব ভাষা সাহিত্যে, ধর্মে ও কর্মে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে একটি অভূন প্লাবন আসে, বহু বর্ষ ধরে জাতির সামগ্রিক জীবনে একটি নতুন মূল্যবোধের

পরিচয় ও তার অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে একবার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এমনি চিন্তাধারার প্লাবন এসেছিল। বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর ভারতীয় চিন্তায় যে জ্ঞানমার্গ নিশ্চিত আসন লাভ করেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ তাঁকে এক নতুন রূপ দান করল। বাংলা সাহিত্য সে-অপরূপ রসে সঞ্জীবিত হয়ে সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হোল। ভক্তিমার্গে তাঁদের পরিপূর্ণ আস্থা থাকলেও জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি মূলতঃ সৌন্দর্যপিপাসু চিত্তের অধিকারী ছিলেন একথা বললে খুব অসংগত হবে না। অথচ চণ্ডীদাস যে রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন তা সৌন্দর্যবোধেরও এক অতীত বস্তু হিসেবেই আমাদের কাছে গ্রহণীয় হ'ল। মানুষ সেখানে সবার ওপরে সত্য অর্থাৎ বহু যুগ ধরে প্রারব্ধ জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তির ফলস্বরূপ সে প্রাণীজগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা মানুষেরই রয়েছে, কারণ যোগ্যক্ষেত্র সে এতাবৎকাল প্রস্তুত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বহু শতাব্দী পরে যে কথাটি বলেছিলেন 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা', মনে হয় যেন চণ্ডীদাসও সেই একই মরমী উপলব্ধির ফলেই পদাবলী রচনায় হাত দিয়েছিলেন। মানবিকতার বোধ যদিও স্বতন্ত্রভাবে আসেনি. যদিও সৃষ্টি ও স্থিতির কার্যকারণসমূহ চিরাচরিত বোধ ও বিশ্বাসের পরেই নির্ভরশীল ছিল, তথাপি চণ্ডীদাসের পূর্বে এমন সত্য কথাটি সহজ করে কোন বাঙালী কবি বলেননি। সে হিসাবে মানবিকতার ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছেন বললে অসংগত হবেনা।

মধ্যবর্তীকালে মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকাব্য ও অন্যান্য লৌকিক কাব্যসংগ্রহে মানুষের চিরকালীন জীবন প্রবাহের অক্ষয় ধারার আনুপূর্ব ইতিহাস রয়েছে—তা যেন সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনার নানা অসম্পূর্ণ দলিল। গভীর অনুভূতি ও চিত্তবৃত্তির সহজ মমত্ববোধে এই সমস্ত কাব্য মানবিকতার শুভ্র ভোর যেন—সেই দিগন্তে অরুণালোকের বিশুদ্ধ ছবিটি রসপিপাসু বাঙালীর প্রাণে এক গভীর স্বাদ এনে দিয়েছে। একাল পর্যন্ত বাঙালী তার নিজস্ব ঐতিহ্যেই মণ্ডিত ছিল, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগ কিছু কিছু দিল্লী দরবারে হয়েছিল তাথেকে বাংলাদেশ রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত ছিল। তাহলেও অবশ্য বাঙালীর কথা বাঙালীর চিন্তা যে বিদেশে আলোড়ন তোলেনি

এমন নয়। তথাপি একথা জোর করে বলা যায়না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাইরের কোন প্রভাব বাঙালীর সমাজ জীবনে অথবা সাহিত্যে বিশেষভাবে পড়েছিল। এদিক থেকে বাঙালীকে আত্মাভিমানী জাতি বললে ত্রুটি হবেনা হয়তো। তবু এমন একটা সময় এল যখন সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে য়ুরোপের চিন্তা জগতের ঢেউ এসে সুদূর বাঙালীর মনকে আলোড়িত করল। যে দুটি বিরাট আন্দোলন য়ুরোপের কর্মে ও ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তার একটি অংশতঃ এবং অন্যটি সম্পূর্ণরূপে একদা বাঙালীর চিন্তাকেও আকৃষ্ট করেছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপেই বাংলা কবিতায় তার প্রকাশ দেখতে পাই। রেনেশাঁস আন্দোলনের ঐতিহ্য আজকের দিনেও আমাদের মনলোকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের অন্তর্নিহিত মুক্তির বাণী ব্যক্তিবিশেষকে আলোড়িত করেছে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা মানুষকে নিকটতর করেছে। সমগ্রভাবে যিনি, একাধারে ভারতীয় জ্ঞানমার্গ ও ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হিসেবে ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মানবচিত্তের প্রতিভূ হিসেবে বাঙালীর ধর্ম সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অবিসংবাদীরূপে নেতৃস্থানীয় আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি রামমোহন রায়। অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের বাণী বহন করেছেন এবং যাঁর সমগ্র জীবন সেই মুক্ত চেতনারই স্বাক্ষর। বাঙালীর জাতীয় কাব্য ও সাহিত্য য়ুরোপীয় জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে সংস্কারমুক্তির বাণী প্রণিধান করেছিল এ দুটি মহান চরিত্রের মধ্য দিয়েই। মানবতাবোধের অত্যুজ্জ্বল আলোকে সেদিন বাঙালী দিক-ভ্রষ্ট হয়নি, সুগভীর মমত্ববোধে কাব্যে নতুন সুর এসেছিল, ঐক্য ও সম্প্রীতির কথাও তারা বিস্মৃত হননি। সর্ব দেশের সর্বকালের মানুষের সঙ্গে বাংলা কাব্যের যে রাখীবন্ধন ঘটল, সে ইতিহাসের পরম ও শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ে আসলেন রবীন্দ্রনাথ। মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় কাব্য সাহিত্যেরও একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন, বাংলা কাব্যের দিগন্ত সেই কারণেই বিস্তৃত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে এসে সবই আনন্দময় এক সত্তায় 'শুভ্র মানবিকতার ভোর' (জীবনানন্দ দাশ) দেখতে পেলুম। ভক্তিমার্গ ও জ্ঞান মার্গ—এ দুটি পথ এসে এক বৃহৎ মানব ঐক্যে সম্মিলিত হ'ল। প্রকৃতির সঙ্গে একনিষ্ঠ আন্তরিকতা যেমন বাংলা কাব্যে নতুন আস্বাদ এনেছে ভাবজগতে মানবিকতার এই নতুন মূল্য নিরূপণও বাংলা

কাব্যের দিগন্ত আরো ব্যাপক ও বিস্তৃততর করেছে। বাংলা কাব্যে বিভিন্ন-মুখী বৈচিত্র এই মানবিকতার অভিজ্ঞতাতেই একটি নিশ্চিত কেন্দ্রে মিলিত হয়েছে। বৈষ্ণব কাব্য, লৌকিক শাখা-কাব্যগুলি ও উনবিংশ শতকের নবজাগরণের কাব্যের মধ্যে তাই যে মানবিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে বয়ে এসেছে তার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও একই বৃহৎ চৈতন্যবোধের স্বাক্ষর।

সমসাময়িক যুগে প্রগতিশীল সাহিত্যের আসরে রোমান্টিক কবিদের আর আদর নেই, তারা ভিক্টোরীয় যুগের প্রারম্ভেই কোথায় যেন অন্তর্হিত হলেন! উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের কবির পক্ষে এমন ভাব-অনুষঙ্গ সম্ভব নয়:

A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw
It was an Abyssinian maid
And on her dulcimer she played
Singing of Mount Abora.

বিশ শতকের গোড়ার দিকে টোয়াইলাইট কবি য়েটস্ সিম্বলিক কাব্যের মাধ্যমে রোমান্টিক ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাও বেশীদিন বেঁচে রইলো না। জর্জিয়ান প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপজীব্য হোল ইংলণ্ড, আর ওয়েল্‌স্ এর মাঠ, ঘাট, বন ও পশুপাখীর বর্ণনা,—রোমান্টিক কাব্যের উপলব্ধিগত স্বাতন্ত্র্য যেখানে অনুপস্থিত। টার্ণার এসে মোড় ঘোরালেন, কিন্তু কীটস্ বা ওয়ার্ডস্বার্থের ঐকান্তিকতা ফিরে এলো না। পরবর্তীকালে ফরাসী ও জর্মন কাব্যের আংশিক প্রভাবে সুর্‌রিয়ালিজম্, দাদাইজম্, ফিউচারিজম্ প্রভৃতি বক্তব্যের ঢেউ ইংরেজী কাব্যে বর্তালো—দু'একজন সমালোচকের মতে যার প্রকাশ রোমান্টিকবাদের অসুস্থ প্রতিক্রিয়ায়।

কেউ কেউ হয়তো তবু আশা করেছিলেন, আবার সে যুগ ফিরে আসলেও আসতে পারে। কিন্তু যখন এলিয়ট বললেন:

At the still point of the turning world
Neither movement from nor towards
Neither ascent, nor decline. Except for the point, the still point
There would be no dance, and there is only the dance,
I can only say, there we have been : but I cannot say where.

তখন শুধু যে কাব্যের ভঙ্গি বদলালো তাই নয়, বক্তব্যের চিন্তানিষ্ঠ অনুধ্যানে কল্পনা-প্রবণতা সংকোচে রাস্তা ছেড়ে দিল। ভিক্টোরীয় যুগের শেষ অংকে সুইনবার্নের সৌজন্যে আমরা শেষ রোমান্টিক কবিতার আভাষ পেয়েছি। সে-যুগ ছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উর্বরা। ম্যাথু আর্নল্ড বা পেটার, সবাই রোমান্টিক কবিদের সৌন্দর্য-অন্বেষায় ব্যস্ত। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয়

শকে আমরা নতুন করে অগাষ্টানদের কলাকৈবল্যে মুগ্ধ হলুম যেন। সে-পথ দখালেন এলিয়ট নিজে। তার রচনায় প্রতিটি ভংগি ও বাক্যবিন্যাস ক্লাসিক যুগের চিন্তা ভাবনা স্মরণে আনে। আমরা এখন পোপকে মর্যাদা দিতে পারি, কিন্তু শেলীর কাব্য শুধু কৈশোরের স্মৃতিগন্ধবহ ছাড়া আর কি!

এখন আসল কথায় আসা যাক্। এরকম রোমান্টিক কাব্য-বিমুখতা কি হঠাৎ এলো, না এর পেছনে কোন প্রচেষ্টা ছিলো কিম্বা কোন ঐতিহাসিক দর্শন? এযুগের ভাবধারাকে বরং ফোর্ড, ওয়েবষ্টার-এর কল্পনার সংগে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগীয় রোমান্স আমাদের অনুভূতিকে ততটা আর আলোড়িত করে না।

অবশ্য চিরাচরিত আলোচনায় যাদের একদিন আমরা শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছি তারা আজ আস্তে আস্তে পর্দার অন্তরালে সরে যাচ্ছে আর যারা একদিন অখ্যাত ছিলো তারা আসছে এগিয়ে। ভার্জিনিয়া উলফ্ এর কথামত এটা ডকাডেন্সের যুগ। যদি তাই হয় তবে এ রোমান্টিক-বিমুখতা কেন? জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় কি অস্তমিত? অথবা এসকল প্রশ্নের সরলীকৃত ব্যাখ্যাই এর কারণ? আমাদের দর্শন কি বিজ্ঞানী দৃষ্টিভংগির অনুশাসনে বাধা? রোমান্টিক কবিরা কি বিজ্ঞানের আদর্শে আস্থা রাখেন নি? বস্তুত একটা তীব্র অসংগতি চোখে পড়ে; আমাদের সত্যকার জীবনধারায় এবং জীবনদর্শনে, আমাদের দৈনন্দিন ভালোমন্দ বিচারবোধে আর চিরন্তন আদর্শবাদে এ অসংগতি সুপ্রকট। শিল্পভাবনার এবম্বিধ সমস্যার সমাধান অনৈক্য অসংগতির যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের 'পর নির্ভরশীল।

এ প্রবন্ধটির মূল প্রেরণা জেকিস্ ব্যারজাঁর Romanticism and the Modern Ego পুস্তকে সন্নিবেশিত লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভংগি এবং উক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রোমান্টিক কাব্যধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট উক্তি (The Marxian Way, 1948 : Renaissance Publishers, Calcutta 12)। ব্যারজাঁ রোমান্টিক কাব্যধারার সমস্ত ইতিহাসকে চুলচেরা বিচার করেছেন এবং রোমান্টিক ধর্ম-র উৎস স্বরূপ নাপোলিয়ঁর সমরোত্তর যুগকে ধরে নিয়েছেন। সেই সূত্র অনুসন্ধান করে তিনি একদিকে সিজার, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ঁ, হিটলার ইত্যাদিকে ক্লাসিকধর্মী আখ্যা দিয়েছেন; অন্য পক্ষে তিনি বলছেন:

> The sustaining principle in man and his new world is not reason but faith......As a romanticist his task is to reconcile the contraries within him by finding some entity outside himself vast enough to hold all his facts.

ব্যারজঁ্যার এ দুটি স্বীকারোক্তিতে তার রচনার অসংগতি নিহিত। রোমান্টিক কাব্যের অন্যতম প্রধান বক্তব্য : Reassertion of the Individual. সমাজচেতনার মধ্যে যখন ব্যক্তির নিজস্ব বিশেষত্ববোধ হারিয়ে যায় তখন রোমান্টিক কাব্য সম্ভব নয়—সমাজজীবন বা গোষ্ঠীজীবনকে পুরোপুরি স্বীকার করে, তার সংগতি যথাযথ বজায় রেখে ব্যক্তি যখন নিজস্ব চিন্তাধারায় পূর্ণ বিকাশ লাভের পথে এগোয়, রোমান্টিক কাব্য শুধু তখনই সম্ভব। কয়েকবৎসর পূর্বে প্রকাশিত সোভিয়েট কবিতাসংকলন Novy Mir এ বরিস্ প্যাস্টারনাকের মতো সূক্ষ্ম দরদী কবি বাদ পড়েছেন এবং সিমোনভ এর Let me kiss thy hand dear......নামে সুন্দর লিরিক কবিতাটি সম্ভবত: অনিচ্ছাসত্ত্বেই সংকলিত হয়েছে। লিরিক কাব্য-সংকলনটির বেশীর ভাগ কবিতার বিষয়বস্তু যুদ্ধভীতি ও সমাজজীবনের ভালো-মন্দ প্রভৃতি বিবেচনাকে কেন্দ্র করে। এমন পরিবেশে রোমান্টিক কবিতার সেদেশে থেকে অদূর ভবিষ্যতে নির্বাসন অসম্ভব নয়; উপরন্তু যদি আবার শিল্প বা সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় সম্বন্ধে সরকারী কমিটি বসে! অথচ স্পেণ্ডার বা আওয়েনের কাছে যখন যুদ্ধের তীব্রতা ও তার বিকৃতি পুরোপুরি ধরা পড়েছিলো—তাঁরা এ ধরনের উক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেননি, It's a pity; ঐকান্তিক বিশ্বাসের নিশ্চিত স্বীকৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রথম অঙ্গীকার, এই re-assertion of the individual তার সত্য রূপ খুঁজে পেলো রেনেশাঁস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সে সময়ে ইয়োরোপে চলছিলো চার্চ এর সংগে রাজশক্তির অনন্ত বিবাদ। ফিউডাল যুগের সামাজিক কাঠামো শক্ত ছিলো, তার বনিয়াদও ছিল সুদৃঢ়। রেনেশাঁস আন্দোলনের পর ইয়োরোপের লোক প্রথম জানলো নবযুগের কথা—ফিরে চাইলো গরিমা-মণ্ডিত গ্রীসের দিকে—তাদের শিল্প, স্থাপত্য, তাদের সংস্কৃতি ইয়োরোপকে নতুন আলোয় স্নান করালো। সেই মুক্তিস্নানে তার প্রাচীনত্বের জরা খসে

গেলো। সেটা হোল নিজেকে জানার অধ্যায়। ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের আরব্ধ জ্ঞান ডেমোক্রেসীতে বর্তায়। সে-পরিবেশ শিল্পী সাহিত্যিকের পক্ষে প্রশস্ত ; কেননা, সৃষ্টিকর্ম তখন সামগ্রিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা লাভ করে এবং যদিও সেক্‌সপীয়র বা দান্তের মত কবি সচরাচর জন্মান না, অথবা কোনো সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণা অনুযায়ী প্রগতিবাদীদের আবির্ভাব হয় না তবু প্রতিভাধরের বিকাশলাভের পূর্ণ সুযোগ তৎকালে ঘটে। হ্যামলেটের আত্মজিজ্ঞাসা শুধু তার ব্যক্তিজীবনের নয়, রেনেশাঁস পরবর্তী যুগের মানুষের পক্ষে এই সচেতনতা-বোধ ঐতিহাসিক সত্য হয়েই দেখা দিয়েছিল। আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্ম-উপলব্ধির পথেই রোমান্টিক কাব্যের জন্ম। এ কাব্যের গতিই ধর্ম ; উপরন্তু একৃসটাসি, লংগিং ইত্যাদি রোমান্টিক কাব্যেরই মনোভঙ্গী।[১]

এই আবেগপ্রবণ অনুভূতিই এক সময় পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য নিয়ে দেখা দেয়, তার কল্পনা রূপাশ্রয়ী হয়, রোমান্টিকতা ক্লাসিক অনুভাবনায় রূপান্তরিত হয় ; রোমন্টিক কাব্যের জন্ম তাই নেপোলিয়ঁর সমরোত্তর যুগে নয়, রেনেশাঁসের সময়। সে-কারণে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্য নাম 'রোমান্টিক রিভাইভ্যাল।' ব্যারজঁার দৃষ্টিকোণ রোমান্টিক আন্দোলনের দার্শনিক সত্যকে বুঝতে পারেনি, তাই তিনি যে কথা বলতে গিয়েছিলেন তাকে সম্পূর্ণভাবে বলতে পারেন নি, মাঝপথে থেমে গিয়েছেন। ফরাসী বিপ্লবকে তিনি রোমান্টিক আন্দোলনের মূল কারণ মনে করেছেন। তার মতে, the outburst of new ideas had to wait until the revolutionary storm blew over ; ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব অবশ্য গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর সঙ্গে অংগাংগি-ভাবে জড়িত রয়েছে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস। সে সময়ে ধীরে ধীরে মধ্যযুগের কুসংস্কার দূর হোল, চার্চের প্রতিপত্তি নষ্ট হোল, সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলো, এমনকি অর্থনীতির বিন্যাস পরিবর্তিত হোল। ধনতন্ত্রবাদের, কলকারখানা প্রসারের যুগ

১ **Forlorn, the very word is like a bell**
To toll me back from my sole self
Adieu! Adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows.

দেখা দিল। এ সবই সত্য, তথাপি যদি রোমান্টিকবাদের প্রথম কথা হয় A passionate belief in the freedom and creativeness of the individual, তাহলে অবশ্যই ষোড়শ শতাব্দীর এ্যাডভেঞ্চারিষ্ট কবি স্যার ওয়াল্টার রলোয়র কাছে ফিরে যেতে হয়।[২] স্পেন্সারের কাব্যেও সেই সুরই খুঁজে পাওয়া যায়।[৩]

এ কথার পরেও যদি ব্যারজাঁ বলে থাকেন, রোমান্টিক কাব্যের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নেপোলিয়ঁর সমরোত্তর যুগে, তাহলে আমরা নিরুপায়।

ইংরেজী কাব্যের ইতিহাসে একটা সুস্পষ্ট সুন্দর ধারা লক্ষ্য করা যায়, এ ধারা বার বার বদলেছে, বার বার নানা মোড় ঘুরেছে, কিন্তু কোথাও সংগতি হারায়নি। বিউলফ কাব্যের বীরত্বগাঁথা একদিন ব্যালাড কাব্যের আসর থেকে বিদায় নিলো। চসার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তার সমসাময়িক সমাজকে, তার নানা রকমের লোকজনকে। রাজা আর বিশপ থেকে চার্চের সাধারণ লোক পর্য্যন্ত কেউ বাদ পড়লোনা। কার মাথায় টুপি নেই, কে ভিক্ষের থলি হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোলো, কার জামার রং এ অস্বাভাবিকত্ব উঠলো ফুটে এ চসারের চোখ এড়ায়নি। শুধু তাই নয়, তখনকার ফিউডাল সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন। তাই ফুটে উঠলো তার কাব্যে সমাজজীবনের সত্যিকার ছবি। এবং লিখলেন তিনি অসামান্য দরদ দিয়ে। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে কবিরা সমাজমানস থেকে চোখ নামিয়ে নিজের দিকে তাকালেন। দেখলেন, নিজের নিজের পরিধি কতো ব্যাপ্ত, অথচ গভীর।

Give me my scallop-shell of quiet
My staff of faith to walk upon,
My scrip of joy, immortal diet
My bottle of salvation
My gown of glory, hope's true gage
And thus I will take my pilgrimage.

For I will walke this wandering pilgrimage
Throughout the world from one to other end......
My bread shall be the anguish of my mind
My drink the tears which no mine eyes do raine
My bed the ground that hardest I may find
So I will wilfully increase my paine.

নানা অনুভূতির রং সেখানে লাগলো, কতো ভালোবাসার কতো বিচিত্র কাহিনী নিজের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা গেলো। নিষ্ঠুর নিয়তি জীবনকে মুক্তি দিল না, লিয়ার মৃত মেয়েকে কাঁধে নিয়ে অভিশপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন; জেকিস্ জীবনদর্শন সম্বন্ধে তার তত্ত্বকথা শোনালেন। ওয়েবষ্টারের নাটকে গম্ভীর ট্র্যাজিক পরিবেশে মানবজীবনের গূঢ় গোপনতার সন্ধান মিললো। এমনি বিচারভংগি এলো রেনেশাঁস আন্দোলনের প্রথম যুগে; সে-যুগে স্বীকৃত হলো ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব, জানা গেল সমাজমানসের প্রথম কথা ব্যক্তিচেতনা। তাই শিল্পের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এলিজাবেথের যুগে চরম ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয়েছিল। অন্যান্যদের কথা বাদ দিয়ে একমাত্র সেক্‌সপীয়র নিয়েই প্রতিপন্ন করা যেতে পারে একথা। তাঁর প্রত্যেক নায়ক (ট্র্যাজেডির নায়ক) এক একটী ব্যক্তি-সত্তার চরম বিকাশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারা প্রত্যেকেই সমাজজীবনে নানাদিক থেকে আঘাত পেয়েছে—ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প বিকাশের যুগে ফিউডাল মনোবৃত্তি বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে। এই সংঘাত সেক্‌সপীয়রের নাটকে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সেক্‌সপীয়র-পরবর্ত্তী ডেকাডেন্ট যুগে জেকোবিয়ান নাট্যকার ওয়েবষ্টার বা ফোর্ডের লেখায় যে রোমান্টিক মেলান্‌কলীর সুর পাই তা আশ্চর্যভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। ডেকার হাল্‌কা ছন্দে রোমান্স লিখে গেছেন, কিন্তু এদের মেজাজে ও ব্যক্তিসচেতনতায় বিরোধ ঘটেনি। রোমান্টিক কাব্য জেকোবিয়ানদের সংগে সংগেই অদৃশ্য হোল, ডনের মেটাফিসিক্যাল দৃষ্টিভংগি ও মিলটনের সৃষ্টিতত্ত্বের ফলস্বরূপ হয়ত রোমান্টিক কাব্য কয়েকশ' বছর চাপা পড়ে রইলো। ব্যারজাঁর কথামতো তাই নেপোলিয়ঁর সমরোত্তর যুগে রোমান্টিক কাব্য জন্ম নিলোনা; সে সময় রোমান্টিক কাব্যের শৈশব নয়, বরং যৌবন। ব্যারজাঁ অন্য এক জায়গায় বলছেন, রোমান্টিক কবিদের ধর্মই হচ্ছে নানা অসংগতিকে মেলাবে তারা বাইরের কোন শক্তির সাহচর্যে, যে শক্তি অসীম, যা সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে দেবে, যার পরিধি আমাদের অকল্পনীয়। এখানে হয়তো ব্যারজাঁর মনে হয়েছে শেলীর কথা:

The One remains, the many change and pass.

কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যারজাঁ শেলীর কাব্য-এষণাকে ভুল বুঝেছেন। এই যে

অদ্বিতীয় যা সব কিছু অসংগতিকে মানিয়ে নিলো তা শেলীর কাছে 'outside himself' নয়। এই 'অদ্বিতীয়'র আভাষ শেলী পেয়েছিলো ভালোবাসার মধ্য দিয়ে।*

এই One অথবা অদ্বিতীয়র অনুভূতি Light, Beauty, Benediction অথবা সর্বশেষে Love শেলীর কাব্যে ব্যক্তিগত। সেখানে এই অতীন্দ্রিয়বাদ আশ্রয় নেয়নি। কোথায় কোন অযৌক্তিকতা নেই, এ তার কবিজীবনের একান্ত অনুভূতির কথা। শেলীর জীবনের ঘটনাবলী কারো কাছে অজানা নেই। প্লেটোর যুক্তিতত্ত্ব, আইডিয়ার অখণ্ড অস্তিত্ববাদ শেলীর মনকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো। উনিশ শতাব্দীর হেগেলিয়ান দ্বন্দ্ববাদ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন তারা একথা আরো স্পষ্টভাবে বুঝবেন। ছোটবেলায় শেলী যতো না কাব্য পড়তেন, তার চেয়ে বেশী পড়তেন বিজ্ঞানের বই, এমনকি তাঁর নিজেদের বাড়ীতে ছোটখাট ল্যাবরেটারী খুলেছিলেন। এবং একথাও অজানা নয়, Necessity of Atheism বলে পুস্তিকা লেখবার জন্য তাকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়; বাবার কাছে জোটে অশেষ লাঞ্ছনাও। তার জীবনের গোড়াপত্তন এমনি যুক্তিবাদের ভেতর দিয়ে; তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না বাইরের কোন ঐশ্বরিক শক্তিকে। সুতরাং তার কাব্যে যে some entity outside himself vast enough to hold all his facts ধরা দেবে, এমন আশা করা যায়না। শুধু তাই নয়, নানা রচনার মধ্য দিয়ে, তার কাব্যে বিভিন্ন ভূমিকাতে শেলী বার বার আত্ম-বিচারকেই রোমান্টিক কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে স্বীকার করে গেছেন। রোমান্টিক যুগের প্রায় সব কবিরাই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কোলরিজের কথা অনেকেই জানেন, কীটস্ তো ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারি করতেন কিছু কিছু, ওয়ার্ডস্বার্থের মতো কবিও নিউটন সম্বন্ধে Ode লিখে গেছেন। তাই একথা বললে বিরাট ভুল করা হবে যে রোমান্টিক কবিরা বৈজ্ঞানিক

* That light whose smile kindles the universe
That beauty in which all things work and move
That Benediction which the eclipsing curse
Of birth can quencheth not, *that sustaining love*
Burns bright or dim
now beams on me
(ইটালিকস্ লেখক-কৃত)

দৃষ্টিভংগিকে স্বীকার করেননি। শেলীর কবিতার নানা জায়গা থেকে প্রমাণ করা যায়, শেলী যুক্তিবাদকে খুব উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। ব্যারজাঁ যে কথা লিখেছেন, sustaining principle in man and his new world is not reason but faith, একথার সত্যতা নানা দিক থেকে অবাস্তব প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। বিশ্বাস যেখানে যুক্তির সংগে হাত মিলিয়ে চলেনা, সেখানে নিছক ভাব-প্রবণতা, পরে fanaticism জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু রোমান্টিক কাব্যের কোথাও নিছক ভাব-প্রবণতা নেই। তাদের কাব্যের গভীরে ছিলো একান্ত জিজ্ঞাসা, আত্মোপলব্ধি ও সুষ্ঠু জীবনদর্শন। দর্শন এলোমেলো চিন্তাধারা নয়, নিছক উপলব্ধির বিকাশ নয়, তার পেছনে থাকে যুক্তির শৈলী। শেলীর কাব্য-দর্শনে যার প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিলো, তিনি তার শ্বশুর মশায় গডউইন। তিনি সে সময় ইংলণ্ডে নতুন জীবনদর্শনের কথা বললেন, যে দর্শনের ভিত্তি ছিলো যুক্তিবাদে। শেলীর লেখায় গডউইনের জীবনজিজ্ঞাসার ছাপ যে কী গভীর হয়ে ফুটে উঠেছিলো, তা ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন। ব্যারজাঁর কথাই যদি সত্যি হয়, যদি এ আন্দোলনের পেছনে যুক্তিবাদ না থাকে, যদি শুধু নিছক ভাবালুতা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, তবে রোমান্টিক আন্দোলন বিরাট বিপ্লবী চিন্তাধারা দিয়ে যেতে অপারগ হোত। অথচ ইতিহাস এবং পরবর্তী ইয়োরোপীয় সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছে রোমান্টিক আন্দোলনের মুক্তি-আশ্রয়ী অবদানকে। ফিউডাল যুগের শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ তার জয়গান গেয়েছে, শেলীর Ode to Liberty-র পংক্তিতে পংক্তিতে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ দেখেছি। এ বিপ্লববাদের সংগে গভীর মানবতাবাদের যোগ না থাকলে তা চিরস্থায়ী আদর্শ হয়ে টিঁকে থাকতনা। কোন কোন সমালোচক ওয়ার্ডস্বার্থকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন। কিন্তু এটা ভুললে চলবেনা, তার মতো শান্তিকামী কবি ফরাসী বিপ্লবের এই পরবর্তীকালীন বীভৎসতা সহ্য করতে পারেননি, মানুষে মানুষে হানাহানি তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার কারণ, রোমান্টিক কবিরা সকলেই প্রথমত মানবতাবাদে বিশ্বাসী।

ইস্কাইলাস্ তার সময়ে যে কথা ভাবতে পারেননি, যে Prometheus Bound লিখে তিনি নিয়তিবাদকে স্বীকার করে গেলেন, শেলী সেখানে মানুষের মুক্তির গান গেয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শক্তিকে প্রমিথিউসের

মধ্যে দিয়ে বিকশিত করেছেন। Prometheus Unbound নাটকের নায়ক শুধু মিথলজির একজন চরিত্র নয়, বরং একটি আইডিয়া, শৃংখলিত মানুষের মুক্তি-কামনা প্রমিথিউসের মধ্যে রূপ পেয়েছে সুন্দর ভাবে। যে বাইরেকার শক্তি সম্বন্ধে ব্যারণ্ এতো সচেতন, সেই Jupiter বা Zeus কে শেলী দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত পরাজিত। মানুষের মুক্তি-কামনার কাছে সর্বশক্তিমান জিউসকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে। ব্যক্তির সৃজনী-প্রক্রিয়ায় মুক্তি-আশ্রয়ী বিশ্বাস না বর্তালে কোন সৃষ্টিকর্ম সম্ভব নয়। রোমান্টিক কাব্যের মূল তত্ত্ব এখানেই নিহিত। যুক্তিবাদ রোমান্টিক ধর্মের বিপরীতপন্থী নয়, বরং পরিপূরক।[৫]

[৫] Romanticism tempered with reason and rationalism enlivened by the romantic spirit of adventure, seem to pave the road to successful revolution (M. N. Roy).

এ প্রসঙ্গে এম. এন. রায়ের Reason, Romanticism & Revolution বইটির (Renaissance Publishers, Calcutta 12) দু'খণ্ড পড়া যেতে পারে।

কাব্য-সমালোচনার ভূমিকা

প্রায় তিনশো বছর আগে সেক্‌স্‌পীয়র আলোচনা-প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি ও সমালোচক ড্রাইডেন তাঁর "ড্রামাটিক পোয়েসি" প্রবন্ধমালায় যা বলেছিলেন[১] তাতে তার স্বাভাবিক বিদ্যাবত্তার এক আশ্চর্য বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁরাও শেষ পর্যন্ত সেকস্‌পীয়রকে যথাযথ মূল্য দিয়েছেন। তিনি যে, বেন্‌ জন্‌সনের ভাষায়, 'লিট্‌ল্‌ ল্যাটিন এবং লেস্‌ গ্রীক' এই মূলধন সহায় করে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন তাতে তাঁর সৎসাহসেরই প্রমাণ মেলে। প্রমাণ মেলে, ভেতরে তাগিদ থাকলে বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োজনকে হয়ত উপেক্ষা করা চলে। তথাকথিত পাণ্ডিত্য অন্তত সেকস্‌পীয়রের মত বিরাট ও মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে। একথা কি আমরা খুব সহজেই স্বীকার করে নিতে পারি না, রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতার মধ্যে ছোট্ট 'সোনার তরী' কবিতাটি অনবদ্য রচনা ; আরো কি স্বীকার করতে পারি না এই কবিতাটি তার কবিকৃতির সরল স্বাক্ষর, বিরাট কোন দার্শনিক তথ্য অথবা বৈদগ্ধ্য কোন কিছুরই ছাপ সেখানে নেই, অথবা তাতে আরোপিত হলেও বিরাট কোন ক্ষয় ক্ষতি নেই। বাঙালী পাঠকমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ এই কবিতাটি পড়েছেন মনে করে' সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করবার বাসনা থেকে বিরত থাকলুম। এ প্রসঙ্গেই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য উপস্থিত করি : এমনি মহৎ সৃষ্টির জন্য, জীবনের আত্যন্তিক উপলব্ধির জন্য পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু যে সাহিত্য যত বড়, যত মহৎ হবে, তার আবেদন তত ব্যাপক ও কালজয়ী হবে। এমন একটি অতি সাধারণ মানদণ্ড যদি শিল্প ও সাহিত্যে না থাকতো তবে চারিদিকে সহজেই নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারতো। কিন্তু এই বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে আর একটু সংযোজনা প্রয়োজন : প্রত্যেক মহৎ শিল্পই দীর্ঘ জীবন-ব্যাপী অনুশীলন ও সাধনার অপেক্ষা রাখে। যাঁরা সমালোচক তাঁদের দিক থেকেও বলতে পারি, প্রাচীন আলঙ্কারিকের বর্ণনা অনুযায়ী, সহৃদয়তা, মমত্ব-বোধ ইত্যাদি বিবিধ গুণে তাঁরা মণ্ডিত হবেন। কাব্যবিচারের সময় বিভিন্ন-

১ Those who accuse him to have wanted learning, give him the greater commendation : he was naturally learned...he looked inwards and found her (nature) there.'

রকম আদর্শের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে সমালোচকও শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হবেন। সমালোচকের কাজ হাসপাতালে মৃতদেহের ওপর ছুরি চালানো নয়, উপরন্তু মৃতপ্রায় রোগীর দেহে প্রাণ সঞ্চালনের অলৌকিক কৌশল। অলৌকিক এজন্য, অতি সাধারণ চিন্তা ভাবনা নিয়ে, প্রাত্যহিক জীবনের আভাষ থেকে কবি যে কি করে চিরকালের সৌন্দর্যকে অনায়াসেই ধরে রাখেন তা অনেক সময় প্রায় অবিশ্বাস্যই মনে হয়। এবং এই অনায়াস প্রচেষ্টাকে কৌশল ছাড়া কি বলবো! কবির এই কৌশলটি সমালোচকের পুরোপুরি জানা চাই। কবির যে কাজ অন্তর্মুখী, সমালোচকেরও সেই কাজ, অবশ্য বহির্মুখী। যিনি লিখছেন তিনি কবি, কবি কি লিখছেন, তার সম্পূর্ণ আভাষ ও ইঙ্গিত যার কাছে সহজেই ধরা পড়েছে তিনি সহৃদয় পাঠক অর্থাৎ সমালোচক। বাংলা সাহিত্যে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যযুগেও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কোন সংস্কার তৈরী হোল না, হাল আমলের কবিকুলের কাছে তা দুর্ভাগ্যের বিষয়। অথচ ইংরেজী সাহিত্যে কাব্যসমালোচনার কাজ কবিদের 'পরই বর্তেছে। সমালোচক ছিলেন কবিরা নিজেই, অকবিরা সেখানে প্রায়ই প্রবেশপথ পাননি। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে থেকে আধুনিকতম এলিয়ট, ডে লিউইস্ একথারই সাক্ষ্য বহন করছেন। যার মধ্যে সমগ্র মানুষকে ভালোবাসবার, এই আকাশ বাতাস মাঠ নদী বন অরণ্যকে আপন করে নেবার, ছোট ছোট তুচ্ছ সৌন্দর্য (যা প্রায় চিরকালীন প্রেরণার মত) খুঁজে বার করবার মন নেই, চোখ নেই তিনি কবি নন, পরন্তু সমালোচকও নন। যার সংবেদ্য মন গ্রহণে পরাঙ্মুখ নয়, হৃদয় দিয়ে যিনি কাব্যবিচারের অনুশীলন করতে সাহসী, কাব্যসমালোচনার দায়িত্ব তারই হাতে। অন্যের হাতে তা ইতিহাসের তথ্যপঞ্জী হবে মাত্র। একথা পরিষ্কার-ভাবে প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সাহিত্য সৃষ্টি অথবা সাহিত্য আলোচনায় ঘটনা বা তথ্যের স্থান কিছু নিয়ে এবং তথাকথিত ভাবেরও কোনও অর্থ নেই যদি না তা কবির মনলোকবিধৃত হয়—তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণে সেই ভাব নতুন কোন অর্থগ্রহণে সচেষ্ট না হয়। সোজা কথায় বলা যায় যেমন ধর্মীয় ভাব। এ বিষয়ে কারু দ্বিমত হবে না যে ধর্মীয় চিন্তা উচ্চ স্তরের, মহৎ কবিতা সৃষ্টির পক্ষে এ নিতান্তই অনুকূল। কিন্তু সেই ভাব নিয়ে কবিতা লিখলে সাধারণত যা হবে তা পদ্যই হবে হয়তো, কাব্য হবে না, অথচ রবীন্দ্রনাথ তার থেকেই অনন্যপূর্ব কাব্যরস সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ জোর

করে কোন ভাব অথবা তত্ত্ব কোন কবি নিজের করে নিতে পারেন না। যদি আরোপ করেন তবে তার ফল হবে অকাল বসন্তের সৌন্দর্যের মত। প্রত্যেক প্রাণবস্তুরই যেমন একটা ইতিহাস আছে, পরিণতি আছে তেমনি প্রত্যেক কবিরও একটি সৃষ্টি-ইতিহাস আছে। যাঁরা দু'চারদিন সখের কবিতা লেখেন, যাঁরা কবিতার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে সমীকরণ করতে শেখেননি, তাঁদের কাছে এমন কথা অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু যাঁরাই একবার মহৎ সৃষ্টির কাছাকাছি যেতে পেরেছেন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ অথবা ইয়েটস্, বোদ্‌লেয়ের-এর কবিসত্তার সত্যকার রূপটি জেনেছেন তাঁরা বুঝবেন, কবির জীবনী ও কাব্যের পরিণতি কি রকম ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর বিজড়িত। সমালোচকের দায়িত্ব এখানেই আরম্ভ। এই গ্রন্থি তাঁকে উন্মোচন করতে হবে। তবে তিনি সেই কবির কাব্যে রসবস্তুর সন্ধান দিতে সক্ষম হবেন। যিনি বাইরে থেকে কাব্যবিচার করেন, কবির মনলোকে প্রবেশ পথ পাননা তার রচনায় প্রথমেই যে ত্রুটি ধরা পড়বে তা হোল অরোপিত পাণ্ডিত্যের। আমাদের বহুদিনের সংস্কারবিজড়িত ধারণা এই যে সমালোচনার কাজ তাঁরাই করতে সক্ষম যাঁরা পাণ্ডিত্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহুস্থানেই দেখা গেছে, সে রকম সমালোচনায় কবির ভাব ও রসসৃষ্টি পাঠকের মন থেকে বহুদূরে চলে গেছে এবং নানারকম উদ্ধৃতির কণ্টকে জড়িত হয়ে তিনি কাব্যরস গ্রহণে বঞ্চিত হচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন না; করলে আমরা জানতুম, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা, কাব্যবোধ ও কাব্যবিচার সমস্ত গুণগুলিই একই সঙ্গে সমালোচকের মধ্যে কি ভাবে উপস্থিত থাকে। শেষের তিনটি গুণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রথমটি সহায় করে সমালোচনা করা অনেকটা মাঝি ও পালবিহীন নৌকোয় ঝড়ের রাত্রে বসে থাকবার মতই। তাঁদের সমালোচনা যতই পড়া যাবে ততই মনে হবে এ নদী অনতিক্রম্য, তীর যেন ক্রমশঃই দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের সুধী সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

> যে কোন বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক না কেন, তাহার আকৃতি প্রকৃতি উৎপত্তিমূল ও উদ্দেশ্য এইচারিটি বিষয় সাধারণতঃ নির্ণেতব্য।

এবং যে মূল চিন্তাধারা থেকে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার

সূত্রপাত করেছেন তা হচ্ছে: 'কার্যকারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান।' কাব্যবিচার ও কাব্যপাঠ নিঃসন্দেহে 'জ্ঞান বিজ্ঞানের' পর্যায়ে পড়ে যদিও আরো একটি সাধারণ গুণ থাকা চাই। তা হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ। এই সৌন্দর্যবোধের ভিত্তি হবে হৃদয়াবেগ। কবিতাপাঠের প্রথম সর্ত হবে যিনি পড়বেন তাঁর মধ্যে এই বিশেষ গুণাবলী থাকবে। কবিতা সত্যকার জাতে উঠল কিনা তারও বিচার সহৃদয় পাঠকের রসানুভূতি দ্বারা স্থিরকৃত হবে। তারপর সেই সৃষ্টি মহৎ বলে স্বীকৃত হলে 'কার্যকারণনিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান' দ্বারা ক্রমবিচার করা হবে। সেই সময়ে কাব্যবিচারের যে-রাস্তা ধরে সমালোচক চলবেন তা হচ্ছে চারিটি জিনিষের যথাযথ নির্ণয়; অর্থাৎ—আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তিমূল ও উদ্দেশ্য। আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিতান্তই আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা। তাতে রসবিচারের স্থান ততটা মুখ্য নয়। সম্প্রতি সে আলোচনা না করে তৃতীয় গুণটি বিচার করা যাক্।

'উৎপত্তিমূল' অর্থে কবিতাটির রচয়িতা যে-ব্যক্তি তার কল্পনা-প্রেরণা। কবি-সম্পর্কে সমালোচকের পরিপূর্ণ অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই—যে দৃষ্টি অনেকটা কবির অন্তর্দৃষ্টির মতই সূক্ষ্ম ও ভাবমণ্ডিত হবে। তা না হলে সামালোচকের পক্ষে কবিকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। একটি কবিতা পড়ে নিছক ভালো লাগলেই সমালোচকের দায়িত্ব শেষ হয় না, সেই ভালো-লাগার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাকে বহুদূর পর্যন্ত যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত একটি নূতন অনাবিষ্কৃত দেশে তাঁকে পৌছুতে হয়, সে দেশই হচ্ছে কবির কল্পনা-ভূমি; যদি ততদূর পর্যন্ত না গিয়ে কোন সমালোচক মাঝ পথেই ফিরে আসেন তবে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ যে কাজ নিজের হয়ে নিজেই করেছিলেন, একবার 'জীবনস্মৃতি'-তে, অন্যবার তাঁর 'আত্ম-পরিচয়' বইটিতে এবং নানা ইতস্ততঃ রচনায় ও চিঠিপত্রে, সে কাজই হলো সমালোচকের কাজ। কবির সঙ্গে সমালোচকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দ্বারাই এ কাজ সম্ভব হয়। সে-আত্মীয়তা একমাত্র সমালোচকেরও একটি বিশিষ্ট কবিসত্তার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সমালোচকের দুটি গুণ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি—একই সঙ্গে তিনি কবি হবেন ও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী হবেন। কবি অর্থে কাব্যবোধের অধিকারী ও কবিতার উৎস সম্পর্কে সচেতন ও বিজ্ঞানী

অর্থে যিনি 'কার্যকারণনিহিত সম্বন্ধানুসন্ধানে' সক্ষম। তাই সমালোচকের কাজ অতি দুরূহ এবং সত্যকার কাব্য-সমালোচক কখনো কদাচিৎ আবির্ভূত হন।

সমস্ত মহৎ সৃষ্টিরই একই সঙ্গে দুটো দিক এবং দুটো ধারা রয়েছে। দুটি দিক সম্পর্কে ইংরেজ কবি কোলরিজ যা বলেছেন তা সহজ সত্য।[২] এমন বহু কবি আছেন যাঁরা বাইরের চটকে, ছন্দের লালিত্যে আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করেন, তাঁদের আদর্শের আবেগে কবিতার মূল অনুভূতিগুলি নষ্ট হয় এবং আমরাও সেগুলি সহজেই উপেক্ষা করি, ভুলে যাই সামাজিক প্রয়োজনের দাবী মেটানো কবিতার অন্যতম দায়িত্ব হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু শুধু সেই কারণেই যদি কবি তাঁর সৌন্দর্যানুবোধ, কাব্যবোধ ইত্যাদি গুণাবলী থেকে ভ্রষ্ট হন, তবে আর যাই হোক, সার্থক কাব্যসৃষ্টি অসম্ভব। এ প্রভেদ অনেক সময় এত সূক্ষ্ম হয়ে দেখা দেয় যে তার মূল্যায়ণ দুরূহ বিচারসাপেক্ষ। ইংরেজ কবি সুইনবার্ণ ও কীট্‌সএ যে প্রভেদ, বাঙালী কবি সত্যেন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশে যে প্রভেদ তা সমালোচককে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে; জানতে হবে, কোলরিজের ভাষায়. What is outward and circumstantial এবং কোনটি inward and essential—এ বিচার শুধুমাত্র নিছক বিজ্ঞানীর বিচার নয়, বরং কবিসত্তার অনুভূতিময় প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে যে দুটি ধারার উল্লেখ করছি তা হোল যুগধর্ম ও কালধর্ম। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে। সেকস্‌পীয়র যা লিখেছেন, এতো অতি সহজ সত্য, তার থেকে এলিজাবেথীয় সমাজব্যবস্থার আভাষ আমরা পাবো। এমন কি স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন' থেকেও নানাভাবে তৎকালীন জীবনধারা আদর্শ ও রাজনীতির আভাষ পাওয়া গেছে। কিন্তু তা যদি তাঁদের চরম উদ্দেশ্য হতো তাঁদের কাব্য সেই যুগের পাঠক শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রায় চারশো বছর পরেও রসবস্তুর সন্ধানেই আমরা আর তাঁদের কবিতা পড়তুম না অথবা পালি প্রাকৃত শব্দের আবরণ ভেদ করে ব্রজবুলির ঈষৎ অপরিচিত শব্দ সম্ভারকে উপেক্ষা করে ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের বাঙালী কবিদের

---

২ We aught to distinguish between what is inward and essential from what is outward and circumstantial.—Literary Reminiscences.

পাঠোদ্ধার করতুম না। এই যোগসূত্র একমাত্র মহৎ কবিরাই রাখতে পারেন। বহুদিন পরে সেকথা হয়ত স্পষ্ট করে বলা যায়। কিন্তু একই সময়ে বাস করে কোন কবির রচনাকে কালজয়ী হবে কিনা একথা সাহসের সঙ্গে বলতে পারাই হবে সমালোচকের কাজ এবং এ কাজ যে কী দুরূহ তাও সহজেই অনুমেয়। এর জন্য কাব্যবোধের সঙ্গে যে দূরদর্শিতা দরকার তা প্রকৃত কবির পক্ষেই সম্ভব। সে কাজ যদি কোন সমালোচকের ওপর পড়ে তবে তাঁকেও কি এই সব গুণাবলীতে মণ্ডিত হতে হবে না?

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হচ্ছে, কবি ও সমালোচকের জাত একই, তবে ব্যবসা পৃথক। বিশেষ করে, একটা কথা জোর দিয়েই বলা যায়, যদি কেউ সমালোচক হিসেবেই সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসনের দাবী করেন তবে জানবো নিশ্চয়ই তিনি একদা কবিপ্রাণ ছিলেন, কবির দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'সংবর্ত'র মুখবন্ধে লিখেছেন; 'সাহিত্যে উক্ত বিশ্বাসের প্রয়োগে প্রেরণা-নামক দায়িত্বহীনতার মর্যাদা-লাঘব অবশ্যম্ভাবী।' এখানে বক্তব্য বিষয়টির যথাযথ অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ সংসারের মূলাধার' এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য সম্পর্কে উক্ত মতামত পোষণ করছেন। সুতরাং এখানে 'প্রেরণা' কথাটির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষতঃ, আমার তো মনে হয়েছে 'প্রেরণা' কোনরকম আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয় অথবা নয় অকল্পনীয় চিন্তাশক্তি। সারাজীবনব্যাপী নানারকম অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও দর্শন—সব কিছুই 'প্রেরণা'র মূলে থাকতে পারে। এতো দেখা গেছে যিনি কোনরকম অনুশীলনই করেন না, তাঁর কাছে তথাকথিত কোন 'প্রেরণা' উপস্থিত হয় না। বরং সহজভাবে এই কথাই বলা যায়, ঘটনাবিশেষে, পারিপার্শ্বিকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও কাব্য-অনুশীলনের ফলস্বরূপ কবির মনে একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সেই মানসিক প্রক্রিয়া নিয়তই তার ব্যক্তিচেতনাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসুষমা দ্বারা ঘিরে রাখে। তারপর যদি কোন কবি সৃষ্টিকার্যে অগ্রসর হন, তাকে 'প্রেরণা' না বললে ক্ষতি নেই. 'প্রেরণা' বললেও কাব্যবিচারের নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। একথার আলোচনা এই জন্যেই প্রয়োজন ছিল যে ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যার

আকস্মিকতা আমরা কার্যকারণবোধে স্থিরনির্ণয় করতে পারি না। কিন্তু তার উপস্থিতি যে একান্তই সত্য তা অস্বীকার সম্ভবত কোন কবিই এ পর্যন্ত করে যাননি। একই দৃশ্য, একই বনপথ, একই সমাজচিত্র কি সময়-বিশেষে কোন ব্যক্তির কাছে বিশেষ বিশেষভাবে রূপায়িত হয় না, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম চিন্তা তাঁর মনে কি উদ্ভূত হয় না? যদি হয়, তবে 'প্রেরণা' নামক বস্তুকে আমরা এত সহজেই কাব্যের অন্দরমহল থেকে নির্বাসিত করি কি করে? সমালোচক যদি কবির কাব্য থেকে এমন একটি স্বচ্ছন্দ অনায়াস ভাবের প্রতিচ্ছবি এক লহমায় চিনে নিতে পারেন, যদি বলতে পারেন তাঁর সৃষ্টির পরম মুহূর্তে এর চেয়ে কার্যকরী আর কিছু নেই, তবে আমাদের অযথা আপত্তি করবার কারণ কোথায়? সমস্ত সাহিত্য অথবা শিল্পসৃষ্টিরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য কথা 'প্রয়াস'—এ সত্য স্বীকার করেও 'প্রেরণা' নামক ভাবটির একটি সুসঙ্গত জাগতিক ব্যাখ্যা চলে। সমালোচককে তাই সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার বক্তব্য আর যাই হোক না কেন, কার্যকারণ-দ্বারা তিনি যেন সব সময়ই তার যথাযথ স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে পারেন, তাঁর বক্তব্য যেন শুধুমাত্র আবেগ-প্ররোচিত না হয়। এ তাঁকে বুঝতে হবে, কবিতাও নিছক আবেগ নয়, শুধুমাত্র ভাব-সমষ্টির একত্রীকরণ নয়। সর্বশেষ একটি ব্যঞ্জনা, কাব্যপাঠের পর একটি অনন্যপূর্ব সুষমা—এ সমস্তই মহৎ কাব্যের পারিপার্শ্বিক লক্ষণ। জহুরী যেমন করে খাঁটি সোনা চেনে, মালী যেমন করে ফুলের সৌগন্ধ চেনে, সমালোচককে তেমনি করেই কবিতা চিনতে হবে; বুঝতে হবে যে, সকল সৃষ্টিকার্যে 'প্রেরণা'ই যদি মূল কথা হয়, তবে সে প্রেরণার ভিত্তি কোথায়, তা শুধুমাত্রই বাহ্যিক ও স্থূল কিনা ইত্যাদি।

কবিতার সমালোচনাও একপ্রকার সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মূলে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা আছে, সেই ধারার উৎপত্তিস্থল কবির কল্পনালোক—যার সন্ধান সমালোচককে নিতে হবে; বুঝতে হবে, সেই চেনাই তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব—এখানে পাণ্ডিত্যের স্থান হয়ত বা আছে, তদুপরি রয়েছে কাব্য-বোধের; তার্কিক-দার্শনিক-বুদ্ধির প্রয়োজন ততটা নেই, যতটা আছে সহৃদয় পাঠকের নিরভিমান দায়িত্ব।*

* ইদানিং বাংলা সমালোচনা পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাশীল আলোচনা বিশেষ চোখে পড়েনা। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধাবলী এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান।

কবিতার ধর্ম

সম্প্রতি কাব্য সাহিত্যের বিচার নিয়ে যে বিভিন্নমুখী আলোচনা হয়ে থাকে তাতে আধুনিক পাঠকের দায়িত্ব সম্পর্কে কখনো কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কবিতার বিভিন্ন ধারার যেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে, রসসৃষ্টি ও ধ্বনি উৎকর্ষের বর্ণনা রয়েছে, তেমনি পাঠকদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'Poetry is something divine' এ-কথা যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন রোমান্টিক কবির উক্তি তথাপি এদেশে প্রাচীনকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যধারার বিস্তীর্ণ পটভূমিতে এ-উক্তির তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়ে। আচার্য অভিনবগুপ্ত কবিতার পাঠককে 'সহৃদয় সামাজিক'-রূপে বর্ণনা করেছেন। কবি যে আনন্দলোক সৃষ্টি করবেন সেখানে সহৃদয় পাঠক তার সৌকুমার্য, সুরুচিবোধ ও তন্ময়ভাব নিয়ে সহজেই প্রবেশ করতে সক্ষম হবেন। শুধু যে কবিরই দায়িত্ব আছে তাই নয়, পাঠকের ভূমিকাও সেখানে উল্লেখযোগ্য।

এবং কবি ও পাঠকের যোগসূত্র এখানেই। যে কবি 'বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য' বিধানে সমর্থ হয়ে পাঠক-সাধারণের অন্তরলোকে প্রবেশ করতে পারেন তিনিই রসসৃষ্টির সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র একবার আদর্শ-চরিত্র বিচারে এই সামঞ্জস্যবিধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং মনে হয় এই বিচার শুধু আদর্শ মনুষ্য চরিত্রের বিষয়ে নয়, কবিতার বিষয়ও সহজেই অনুকরণীয়। এ-কথা সত্য, সামাজিক প্রেক্ষিতেই বিভিন্ন যুগের কবিতা তার স্বরূপ প্রকাশ করে, ভাবে ভাষায়, আঙ্গিকে ও ব্যঞ্জনায় বিশেষ-কালের প্রতীক হিসেবেই আমরা কবিতার বিচার করে থাকি। কিন্তু এ কথাও তেমনি সত্য যে বিভিন্ন যুগের মানব চরিত্র, সমকালীন সমাজের পটভূমিতে মানুষের অভিব্যক্তি ও তার প্রকাশই সকল কালের কবিতার বিষয়বস্তু। কবির দায়িত্ব সম্পর্কে সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলছেন, এমন শব্দ নেই, এমন বিষয় নেই, এমন ন্যায় নেই, এমন কলা নেই যা কাব্যের অঙ্গ হতে পারে না, এবং কবির দায়িত্ব এই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে খুঁজে বার করা। অতি প্রাচীন ভারতের কাব্য আলোচনার রীতির সঙ্গে অতি আধুনিক কাব্য সমালোচকদের যথেষ্ট সংযোগ দেখা যায়। কি বলবো তাই বড় কথা নয়, কেমন করে বলবো তাই প্রথমত লক্ষ্যণীয়,—

এমনিতর জিজ্ঞাসা এ, সি, ওয়ার্ড প্রমুখ সমালোচকদের আলোচনায় চোখে পড়েছে। এজ্‌রা পাউণ্ড ও তার অনুকারকের দল কত কিছুই যে কবিতার বিষয়ীভূত করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রায় এই রকম স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনায় রয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত তাঁর কোন একটি চিঠির কিছুটা উদ্ধৃতি এই প্রসংগে করা যাক্: 'মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যথার্থে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের, সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্য তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকে নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে।' মানুষের চিন্তার সঙ্গে ভাষার একটা গভীর ঐক্য আছে, তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এই উপলব্ধির নিবিড়তার কথা আনলেন তখন এ ত' সহজেই অনুমেয়, প্রকাশভঙ্গির সুচারু বিন্যাসও তারই সঙ্গে পা ফেলে চলবে। শিল্পের দায়িত্ব সম্পর্কে যে আধুনিক যুগে বলা হয়েছে, শিল্পী এবং পাঠক ও দর্শকের সংযোগ বিধান করা, তাতে অন্যায় কি? এই যোগসূত্র স্থাপিত হলে, বিষয় এবং বিষয়ীর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা সুদৃঢ় হবে এবং শিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা তার সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

কবিতার ধর্ম কি এ প্রসঙ্গে বহু জটিল বিষয়ের অবতারণা সহজেই হতে পারে এবং দার্শনিকরাও সেই আলোচনায় যোগদান করে বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। তাই, যদি সাধারণ পাঠকের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যদি সেই আবেদনে পাঠকের মনে কোন নিগূঢ় রসের আস্বাদন অনুভূত হয়ে থাকে তবে পাঠকের দৃষ্টিতে কবিতার ধর্ম এবং আলোচনা বিষয়ের সত্যতাকে প্রতিভাত হতে সাহায্য করবে। আরিষ্টটল্ যে emotional delight-এর কথা বলেছেন কবিতার ক্ষেত্রে তাই প্রধান আবেদন এবং যদি কবিতার ধর্ম বলতে এমন কিছু বোঝা যায় যা দেশকাল-নিরপেক্ষভাবে পাঠক সাধারণের রসানুভূতি-লাভে সাহায্য করবে তবে কবিকে প্রথমতই এই প্রচেষ্টায় তৎপর হতে হবে। বলা যেতে পারে, কবিতার ধর্ম তার স্বরূপ এবং কবির সত্যদৃষ্টিই কবিতার স্বরূপ। কবির সত্যদৃষ্টি কথাটি বহু-ব্যবহৃত এবং ব্যাপক। এর নানা-

রকম দার্শনিক সংজ্ঞা পেরিয়ে গিয়ে সহজে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে, সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে সাধারণভাবে মানবজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কোন স্বকীয় ভাব-বোধই এই সত্য-দৃষ্টি। এই অভিজ্ঞতার মাত্রা বিভিন্ন হতে পারে, ভাব-বোধের বৈচিত্র সহজেই কবিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তবু এক জায়গায় সমস্ত বিরোধ এবং পার্থক্য একটি বৃহত্তর অথবা মহত্তর সমন্বয়ে এক হবে। এই সমন্বয় মানব-জীবনের চিরন্তন ধারার স্বীকৃতি, ইতিহাসের প্রকৃতি-নির্ণয়ে কবি-মনের উন্মুখতা এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব অথবা সংযোগ ও ঐক্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াসমাত্র।

চসারের ক্যান্টারবারী টেল্স্ আজ থেকে প্রায় ছ'শ বছর পূর্বের রচনা। ক্যান্টারবারীতে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের লোক ধর্ম উপলক্ষ্যে রওনা হয়েছে। রাস্তায় একটি সরাইখানায় তাদের সকলের সাক্ষাৎ হল। রাস্তা অতিক্রম করবার সহজ একটা পথ তারা আবিষ্কার করলো। সবাই যেতে যেতে গল্প বলবে যার যা অভিজ্ঞতা। এমনি করে গল্পে গুজবে সমস্ত রাস্তা সহজেই অতিক্রান্ত হবে। এই হচ্ছে ক্যান্টারবারী টেলস-এর পরিকল্পনা। কত রকমের মানুষ—ব্যবসাদার, ফ্রায়ার, নান্, প্রভৃতি কত বিভিন্ন শ্রেণীর। কত বহুমুখী চরিত্র, কত ঘটনা—তদানীন্তন ইংলণ্ডের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের ব্যপক চিত্র। চসারের সংবেদ্য মন তাকে নিজের স্বচ্ছ আয়নায় ধরে রেখেছে, আজও পর্যন্ত যার প্রতিবিম্ব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চরিত্রগুলি সবাই জীবন্ত। তাদের চালচলনে, কথাবার্তায়, হাসিঠাট্টায় সহজেই তারা পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে। আজ ইংরেজী ভাষার বহু পরিবর্তন হয়েছে। সে সমাজ-জীবন নেই, ব্যক্তির উপরে ধর্মের প্রাধান্য এখন অন্তর্হিত, তথাপি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে, সমাজ-জীবনের সঙ্গে কবি-মানসের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের সাক্ষ্য হিসাবে বইখানি আজও সাদরে স্বীকৃত। এমনি আমাদের দেশের মঙ্গলকাব্যগুলিতে, ব্যাঘ্রদেবতার কাহিনীতে যদিও নানারকম অবাস্তব ও কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে তবুও বর্ণিত চরিত্র-গুলি আমাদের কাছে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সত্যরূপে স্বীকৃত। তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংযোগ কবিতাগুলির মূল আখ্যানবস্তুরূপে গৃহীত হোত। রবীন্দ্রনাথের বা তার পরবর্তীকালের রচনায় মধ্যযুগীয় রীতি ও

ধারা পরিবর্তিত হলেও কবিতার আবেদনে বস্তু ও ভাবের এই সমন্বয় লক্ষিত হয়। কবিতায় এই সমন্বয়-বোধ তার স্বরূপ নির্ণয়ে সাহায্য করে। টমাস হার্ডির উপন্যাসে যেমন একটি tragic universe সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে যেমন সমাজ, মানুষ, তার ক্রিয়াকলাপ, নিষ্ঠুর নিয়তি সমস্তই নিজের নিজের ভূমিকায় অবতরণ করে এক অকল্পনীয় পরিবেশ তৈরী করেছে তেমনি মহৎ কাব্যের আবেদনেও একটি বিশেষ কাব্যলোক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এই কাব্যলোকের মধ্যে কবিতার সঙ্গে জীবনের, ভাবের সঙ্গে বস্তুর সমন্বয়-বোধই প্রধান উপকরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য কি অথবা নিছক রসসৃষ্টি ব্যতীত একান্তই অপর কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা এ সমস্ত আলোচনার কোন নিশ্চিত মতামত এখনো তৈরী হয়নি। অথচ মানুষের যেমন আঘাতে দুঃখ আছে, বিরহে বেদনা আছে তেমনি দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা আছে, সমাজের শৃঙ্খলা আছে, এবং ব্যক্তি জীবনে আরও অনেক প্রাসঙ্গিক জটিলতা আছে। এর কোন কিছু থেকেই নিষ্কৃতির পথ নেই। এ দুস্তর রাস্তা তাকে অতিক্রম করতেই হবে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। একদিকে যেমন জীবনের এই প্রবহমানতা রয়েছে অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তির ভাবলোকে এই সমস্ত কিছুরই প্রতিচ্ছবি অনবরতই পড়ছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যে সংঘাত, আর ব্যক্তির ভাবলোকে তার যে প্রকাশ, এ দুয়ের সংযোগ-বিধানে কাব্যলোকের উপকরণ তৈরী হয়। তখন যেমন মঙ্গলকাব্য অথবা ক্যান্টারবারী টেলস্ কাব্যসাহিত্যের আসরে স্থান করে নেয়, তেমনি বৈষ্ণব গীতিকাব্য অথবা গীতাঞ্জলিও আমাদের রসপিপাসু চিত্তকে মুগ্ধ করে। মহাকাব্যে যেমন পরিপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হয়, খণ্ডকাব্যে অথবা গীতিকাব্যে তেমন সম্ভব নয়। তবুও কবির দৃষ্টি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ, ভাব ও বস্তুর এই সমন্বয় সাধনে কৃতসঙ্কল্প। তা না হলে তার কাব্যজগৎ সুসম্পূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত হবে কি করে? একজন আধুনিক কবির কয়েকটি লাইন এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি:

> সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
> পাতাদের উৎসরণে কোন শব্দ নাই;
> তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জ্জনে
> বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

এবং পরবর্ত্তী পংক্তিগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয় :

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ;—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

কবির মনলোকে যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে সেখানে এক স্তব্ধ বিষণ্ণতা, দূরে যুদ্ধের সংকেত আর ঠিক সেই সময়েই 'ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে' 'যূথচারী কয়েকটি নারী'। এই ছবিটির যেমন সাম্প্রতিক পরিবেশ রয়েছে তেমনি একটি চিরন্তন আবহ সৃষ্টিতেও সক্ষম হয়েছে। এবং তারপরে—

—এই নীচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব ;—বিনুনিতে নরকের নির্ব্বচন মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

(জীবনানন্দ দাশ—গোধূলি সন্ধির নৃত্য)

দ্বিতীয় পর্ব : বাংলা কবিতার ঋতুবদল

> গ্যেটে সম্বন্ধে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'Here is a complete man'; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা। সব বই পড়া হ'লে, সব দেশ দেখা হ'লে, কোন প্রৌঢ় পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলতে পারেন, এতদিনে দেখলুম একটি সম্পূর্ণ মানুষ।
>
> (বুদ্ধদেব বসু : সব-পেয়েছির দেশে)

রিল্‌কের সমসাময়িক কবি ও নাট্যকার হুগো ফন্ হফ্‌ম্যানষ্টাল বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'দি লেটার্স অব লর্ড সাণ্ডোস' প্রকাশ করেন (১৯০২)। বইটিতে এক স্থানে যে স্বীকারোক্তি রয়েছে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলুম :

> In those happy stimulating days, there flowed into me as though through never congested conduits the realisation of form—that *deep true inner form*—which can be sensed only beyond the domain of rhetorical tricks: that form of which one can no longer say that it organises subject matter, for it penetrates it, dissolves it, creating at once both dream and reality, an interplay of eternal forces, something as marvellous as music or algebra. (ইটালিকস্ লেখক-কৃত)

উদ্ধৃতিটি আমাদের পক্ষে একান্ত মূল্যবান, কেননা এলিয়টের প্রবন্ধাবলী পাঠে আমাদের এমন বোধ জন্মেছিল যে, কবিতার রচনাকালে বিষয়বস্তু, চিন্তা-ভাবনা বা কল্পনা প্রবণতা তত কার্যকরী নয় যতটা সুনিপুণ কলা-কৌশল। অবশ্যই এলিয়ট তা মনে করেন নি। ই. ই. কামিংস ও তার অনুকারকের দল ঐতিহ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেও, সত্যকার কবিতা ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই বেঁচে রইল এবং হফ্‌ম্যানষ্টাল যে বলেছেন "রেটোরিক্যাল ট্রিকস্"-এর আওতার বাইরে রয়েছে "deep true inner form" এবং যা নাকি বিষয়বস্তুতে অনুপ্রবেশ ক'রে অবশেষে একই সত্তায় অঙ্গীভূত হয়েছে তা-ই কাব্যের অন্তত মূল কথা।

এই প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে একথা বলার প্রয়োজনীয়তা ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথ শুধু এলিয়ট নন, আরো অনেক কবিরই আলোচনাপ্রসঙ্গে আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, সময় নয়, মর্জিই হচ্ছে এর আসল মাপকাঠি, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন তিনি স্বেচ্ছায় তাদের অনেকের কবিতা কিছু কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যে বিশেষ অর্থে আধুনিকতা বর্তমানকালে একটি প্রচণ্ড শক্তি হয়ে শিল্প-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি, এবং যদি যৌবনের অক্ষুরন্ত বিকাশ হয় আধুনিকতার মর্মকথা তবে তাঁর চেয়ে অতি আধুনিক আর কে? য়ুরোপের শিল্পসাহিত্যে জীবনকে যে চোখে দেখা হয়েছে সে চোখ, সে মন হয়ত রবীন্দ্রনাথের ছিল না, থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু জগৎসংসারের যে বিশেষ লক্ষণগুলির পর ইতিহাসের পরিক্রমা তা বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হচ্ছিল অন্যদিকে তেমনি সমাজ সংহতিতে মানবিক মূল্যবোধের পারস্পরিক চেতনাবোধে নতুন দৃষ্টিভংগি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ভালো এবং মন্দ, সৎ এবং অসৎ, ন্যায় এবং অন্যায় ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নগুলি মানুষকে নতুন করে চিন্তার জটিল সূত্রাবলীতে আবদ্ধ রাখলো। হোয়াইটহেড্ যে উনবিংশ শতাব্দীকে 'An epoch of civilised advance বলে বর্ণনা করেছেন অথচ সেই সঙ্গেই স্বীকার করেছেন 'The values of life are slowly ebbing' এবং ফলস্বরূপ সভ্যতার বহিরঙ্গ এবং সৌষ্ঠব যদিবা রয়েছে নেই তার কোনই অস্তিত্ব'[১] এমন স্বীকারোক্তি করেছেন, তা আজকের দিনে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ অতিক্রম করে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। ভিক্টোরীয় যুগের চরম প্রকর্ষের মধ্যেই নিহিত ছিল পরম ক্ষতির সম্ভাবনা। সে সময় একথা বুঝবার দায়িত্ব মানুষের ছিল যে ইতিহাসের গতি সরল নয়, অথবা নয় তার প্রগতি শুধু ঊর্ধ্বমুখীন; বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তনের মুখে এমন সব চেতনা কাজ করে যার ফল সুদূরপ্রসারী। ভারতবর্ষে এ সকল চিন্তার ঢেউ এসে পৌঁছোলেও তৎকালীন রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না থাকায় পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতই ইংরেজী কেতার মাধ্যমে আমাদের য়ুরোপের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে

১ Whitehead A. N.—Adventure of Ideas.

হাতে খড়ি নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই যতবার বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন, ততবারই তাঁর এ সকল অভিজ্ঞতলাভ ঘটে থাকলেও মনের মধ্যে মূল গাড়তে পারেনি, কেননা বাঙালী এবং ভারতীয় সংস্কার থেকে যে প্রথম পাঠ তিনি নিয়েছিলেন তা এতই দৃঢ়মূল ছিল যে য়ুরোপের ভাঙনের চিত্র তাঁর কাছে মানব ইতিহাসের চরম শিক্ষার বিষয় হলেও পরম তত্ত্বের বিষয় ছিল না। অথচ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন এ সকল দৃশ্যে নিশ্চিন্ত থাকেনি, বিক্ষিপ্ত হয়ে নানাভাবে তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। স্বদেশীযুগের আন্দোলনের মধ্যে তিনি নিজেকে বারবার আত্মনিমগ্ন রেখেছেন এই মূলমন্ত্র সহায় করে যে, য়ুরোপের কর্মক্ষমতা এবং জীবনের ভোগবাদ, পরম আদর্শ না হ'লেও আমাদের চারিত্রিক জড়ত্বকে অনেকাংশে বিনষ্ট করবে, এবং য়ুরোপের কর্মচঞ্চলতা আমাদের মধ্যে পুরোপুরি না বর্তালেও আপাত অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। ওদেশের আধুনিক জীবনে যে টানাপোড়েনের চিহ্ন তিনি লক্ষ্য করেছেন তার সঙ্গে নিজের আমূল ফারাক সম্বন্ধ হলেও আপনাকে সঙ্কুচিত করে নেন নি, বরং তৎকালীন য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির একটি কবিতার এ-হেন তর্জমা করেছিলেন যার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

এদিকে উটওয়ালা গাল গাড়ে, গনগন করে রাগে
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিবে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা, নগরীতে সন্দেহ
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুস্কিলে পড়া গেল।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম সরাবখানায়, তার কবাটের মাথায় আঙুরলতা
ছ'জন মানুষ খোলা দরজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।

এবং নিছক অনুবাদের জন্যই যে অনুবাদ করেননি তাও বোঝা যায় শেষ ক'টি লাইনে :

এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও

মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড় কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম আমরা ফিরে, আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
কিন্তু আর স্বস্তি নেই পুরনো বিধানের মধ্যে
যেখানে আছে সব অনাত্মীয় তাদের দেবদেবী আঁকড়ে ধরে।
আর একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

এর ভাবানুষংগ আধুনিক মানুষের এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষার্দ্ধে সভ্যতার গ্লানিতে পীড়িত হয়ে যে একাধিক কবিতা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সাহিত্যের উচ্চকোঠায় তাদের আসন না হোক, তাঁর ধ্যানধারণা, চিন্তা ও কল্পনার জীবন্ত স্বাক্ষর হিসেবে সেগুলি অনাগতকালের রবীন্দ্রপাঠককে অনেক অনুচ্চারিত প্রশ্নের উজ্জ্বল সমাধান এনে দেবে। টেনিসন আজ থেকে একশত বছর আগে পুরনো বিধানের বিদায়বাণী গেয়ে রেখেছিলেন; তাঁর মধ্যেও এক ধরণের আধুনিক মননশীলতা ছিল এবং নিজের শিল্পসৃষ্টিতে, যদিওবা তার স্বাক্ষর না থেকে থাকে, অনতিস্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছিলেন ইতিহাসের গতি ঋজু, নিষ্ঠুরতম তার পরিক্রমন এবং সেই সঙ্গে আরও দুঃখময় জীবন-চিন্তার প্রাগসর অথচ নিঃসংশয় অর্থহীন অনুকারিতা। এবং অনেক বেশী প্রতিভাধর হয়েও যেহেতু রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের সগোত্র কবি তাঁরও এমন একটি সুসম প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল যে শিল্পবিচারে খুব সার্থক না হলেও কয়েকটি কবিতা তিনি শেষ জীবনে লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যার সত্য বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর রূপেই অভ্রান্ত। [রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ আলোচনা প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠককে বিমলচন্দ্র সিংহের 'সমাজ ও সাহিত্য' নামক বইটি পড়তে অনুরোধ করি।]

একথা স্বীকার্য, সাহিত্য তথা কাব্যবিচার প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি না হোক, অন্ততঃ ঘনিষ্ঠ অধ্যায়গুলি জানা প্রয়োজন। মানুষ বিভিন্ন পরিমণ্ডলের মধ্যে একই সময়ে বাস করে' বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে, প্রাক্তন অভিজ্ঞতা নবলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পরিমার্জিত করে। সুতরাং জীবনের ভূগোল-

ইতিহাসের দ্রাঘিমা-লঘিমা এবং সনতারিখের প্রাথমিক পরিচিতি পাঠক-সাধারণের কাছে জ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। সুবিধের কথা, রবীন্দ্রনাথের জীবনের পূর্ণ পরিচয় না হোক্ আংশিক পরিচয় যে অনায়াসলব্ধ সেকথা বাঙালী মাত্রেই জানেন। ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকখানি, তদুপরি মহর্ষির জীবনধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালীন জীবনদর্শনের সবিশেষ মিল আছে। আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত শক্তিতে তাঁর যে অবিচল আস্থা ছিল সে ধারণার পাঠও তিনি পিতার কাছেই পেয়েছিলেন। সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দা থেকে তিনি যে অনুভূতিবলে একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তা তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণেরই হয়তো বা ফলস্বরূপ। কিন্তু এই পরিচয় রবীন্দ্রনাথের অংশমাত্র।

ভারতীয় চিন্তাধারা যেমন তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি পরবর্তীকালে য়ুরোপীয় ভাবধারা তাঁকে ক্রমাগতই পরিবর্তনশীলতায় আস্থাবান করেছে। অচঞ্চল হলেও সত্যের প্রকারভেদ আছে, সময় সমাজ ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্নতর বিকাশেই তার সিদ্ধি, এবম্প্রকার ধ্যানধারণা আয়ত্ত হতে যদিও তার মধ্যবয়েস কেটেছে, তবু আধুনিকতার যে প্রবেশপত্র পাকা দলিলের মতই তার করায়ত্ত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, আধুনিক শব্দটি তত্ত্বগতভাবে একটি মূল মানসিকতাকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রধান লক্ষণ যার মনের সম্প্রসারতা। যেকালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালি সিংহ আধুনিক ছিলেন, সমাজ শিক্ষা নীতিবোধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে বাংলা দেশকে নতুন পোষাক পরিয়েছিলেন, যাঁর প্রচণ্ড সত্য সাহসিকতা আজও বাঙালী সহৃদয় চিত্তে অসঙ্কোচে গ্রহণ করে নিতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথ সে যুগেই তার বাল্যযুগ কাটিয়েছেন। অতএব ঐতিহ্য ও পরিবেশ তাকে ভীরু কুসংস্কার থেকে মুক্ত রেখেছিলো, সাদা চোখে ও খোলা মনে দেখতে শিখেছিলেন বাঙালীর জরাগ্রস্ত মনের নিরঙ্কুশ চেহারা। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি তিনি, বয়েসকালে আদর্শ কর্মযোগীর মতো প্রাচীনত্বের মুখোস খুলবার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আধুনিক মনের এ সকল লক্ষণই তার জীবনে, কর্মে ও সাহিত্যে প্রতিভাত। তার বাড়ীর মেয়েরা প্রথমে ইংরাজী শিখেছিলেন, পিয়ানো বাজিয়ে রসিকজনকে গান শুনিয়েছেন, বাড়ীর ছেলেরা

প্রথম সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশ থেকে বিজয়মাল্য অর্জন করেছেন। বহু-কালকার অচলায়তন এমনি করেই বাঁধ ভেঙে বাঙলাদেশে প্রাণবন্যা বইয়ে দিয়েছে। আর তাতে এক সময় রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজে উপকৃত হয়েছেন, কালে-দিনে তিনিও তেমনি আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে গেছেন। আধুনিক চিত্তের সঙ্গে যে যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্য একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট তা তিনি যেমন বুঝেছিলেন এমন আর কে? একাধিক কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধ আজও তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। আধুনিকতার অন্যতম ধর্ম চিত্তের এই সম্প্রসারতায়, অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণে, বর্জনে নয়; এবং এ বিষয়ে তিনি রামমোহনের যোগ্য উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন। একমাত্র পথিকৃত না হলেও তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপনা করে গেছেন, আমরা আধুনিকরা আজও শিল্প সাহিত্যের বিচারে সেই পথেই চলে আসছি। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে একদিকে আমাদের চিত্ত ভারতীয় ভাবধারায় দৃঢ়মূল লাভ করেছে, অন্যদিকে বহিরাগত প্রভাবকেও অন্তরঙ্গ করে নিয়েছি। সে কারণে আমাদের সাহিত্যপাঠের শুরুতে মাইকেল বা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ঘনিষ্ঠ, পরবর্তীকালে নিগূঢ় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে তেমনি বিদেশী লেখকের উপন্যাস বা কবিতার সঙ্গে।

'শেষের কবিতা'র আবির্ভাবের সময় আমি ছিলাম কলেজের ছাত্র এবং বাংলা সাহিত্যে নবাগত। বাংলা সাহিত্যের একটা সন্ধিক্ষণ তখন 'কল্লোল' কেন্দ্র করে হাওয়াবদল ঘটছে, আর তাই নিয়ে মুখর হয়ে উঠছে সমালোচনা। আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি, বিরুদ্ধ দলেরও প্রচণ্ড উৎসাহ। তারুণ্যের সেই নবজাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শ আর মেনে নিতে পারছি না আমরা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা তীক্ষ্ণতার দিকে, তীব্রতার দিকে, তার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড মৃদু বলে ঘোষণা করতে আমরা তখন কুণ্ঠিত হইনি। ঠিক এইরকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দু'টি উপন্যাস বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পর পর দেখা দিলো। 'যোগাযোগ' প্রথমটায় আমাদের মনে তেমন নাড়া দিলো না, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরোনো মাত্র থিতিয়ে যেতে হোলো। মাসে মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে

পড়তে অন্য একটি দরজা খুলে যেতে লাগলো—দেখা যেতে লাগলো আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন কী সহজে, কী সম্পূর্ণ করে, কী সুন্দর ভঙ্গীতে—অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মূর্তি—যেন আমাদের চেয়েও বেশী আধুনিক। ...আমাদের কল্পিত রবীন্দ্রযুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো, যেটাকে আমরা রবীন্দ্রযুগ আখ্যা দিয়েছিলাম, সেটা যে নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তমান সেটা বুঝতে পেরে অনেক ধারণা বদলে গেলো আমাদের। বারবার যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর এক নতুন জন্ম।

('শেষের কবিতা,' বুদ্ধদেব বসু, চতুরঙ্গ ॥ কার্তিক ১৩৬১)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি প্রয়োজনীয়, কেননা যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকেরা ত্রিশের যুগে বাংলা সাহিত্যে, আধুনিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এবং এই আন্দোলন যেকালে মূলত রবীন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে সেহেতু এ স্বীকারোক্তির মূল্যও অনেক। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও তাঁর গানের আলোচনা বাদ দিলে (যে বিস্ময়কর সৃষ্টির তুলনা অন্তত এদেশে বিরল) কথাসাহিত্যেই সম্ভবত, বিশেষ করে শেষের দিকের উপন্যাসগুলি ও 'তিন সঙ্গী'র অন্তর্গত গল্পগুলিতে, আধুনিক মন ও রচনাভঙ্গীর যে অভিনবত্ব আছে তাতে যে কোন পাঠক বিস্মিত মুগ্ধ ও বিপর্যস্ত হবেন। 'বিপর্যস্ত', কেননা, সত্তর বছরেও একজন শিল্পীর পক্ষে নিজের রচনার ঐতিহ্যকে এক পাশে ঠেলে রেখে নতুন করে শিল্পচর্চার তাগিদে নিবিষ্ট হওয়া যে কি দুঃসাহসের পরিচয় তা কি সহজেই অনুমেয় নয়? এমন বেগবান, এমন স্বচ্ছ সহজ নিরাভরণ ভাষা, এমন তির্যক ভঙ্গী, ব্যঙ্গের সুনিপুণ প্রয়োগ, এমন রসবৈচিত্র্যের সুচারু পরিবেশন কেমন করে সে-লেখকে সম্ভব যাঁর প্রথম উপন্যাসের ভাষা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমেরই সহজ সংস্করণ মাত্র :

> তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া আমার ইহকালের সকল দাবী মুছিয়া ফেলিব, এতো ভালো আমি নই—ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে কি পাইব? (চোখের বালি)

'চোখের বালি'র রচনাকাল ১৯০৩ সাল। ১৯১৬ সালে রচিত 'ঘরে বাইরে'র ভাষা ধরা যাক্—

> আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই··· তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে, যতদূর পর্যন্ত একপথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশী টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন।

এবং ১৯২৯-সালে রচিত 'শেষের কবিতা' অথবা তারও পরে রচিত 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)-এর ভাষা পাশাপাশি রেখে গেলে বুঝতে পারি তাঁর মধ্যে যতটা পরিমাণে আধুনিকতা ছিল, আধুনিককালে জন্মগ্রহণ করেও অনেক প্রতিভাধর শিল্পী ততটা আধুনিক ছিলেন না। বস্তুত এই বুদ্ধদেব বসুরই অথবা তাঁর সমকালীন প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অচিন্ত্যকুমারের ভাষা ত্রিশবছরে কতটুকু বদলেছে? কতটুকু তাঁরা বেশি আধুনিক হতে পেরেছেন ১৯৫৭-তে, ১৯২৯-এর চেয়ে? কিন্তু শুধু ভাষা ও আঙ্গিক নয়, তাঁর আধুনিকতার মূল ছিলো আরো গভীরতর মননশীলতায়। 'চোখের বালি'র উদ্ধৃত অংশটি বিনোদিনীর স্পর্ধিত উক্তি। সে উক্তির পিছনে নারীজীবনের করুণ বিয়োগান্ত কাহিনী রয়েছে, অথচ যার সাহসী প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর খুব বেশি কখনো হয়নি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ রোহিণীর চরিত্র বাদ দিলে এ সমস্যার কথা আর উত্থিত হয়নি এবং রোহিণী চরিত্রের অসংযম ও দুর্বলতা তাকে ট্র্যাজিক করলেও মহান করতে পারেনি, অথচ উদ্ধত স্পর্ধা, অসহনীয় যন্ত্রণা ও আবেগময়তা সত্ত্বেও বিনোদিনী সংযমের মধ্য দিয়েই মহত্ত্ব অর্জন করতে পেরেছে। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চোখের বালি' বইটিকে যে 'নতুন পুরাতনের সন্ধিস্থল' বলে বর্ণনা করেছেন তা অযৌক্তিক নয় এবং অস্বীকার করে লাভ নেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিরও অনেক আগে বিশ শতকের সামাজিক সমস্যার, নর-নারীর সম্পর্কের কথা তিনি উপন্যাসে রূপায়িত করতে পেরেছেন। ঘরে-বাইরে'-তে নিখিলেশের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে বলা বাহুল্য তা-ও সময় ও সমাজের পরিবেশে যথেষ্ট আধুনিকতার দাবী করে।[২]

২ যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তবা আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি এ কথা বলা চলে যে লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে অগোচরে কাজ করছে। আমাদের দেশের

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' বইটি 'ঘরে বাইরে' রচনার বহু পরেকার। এবং দু'টি বইয়ের বিষয়বস্তুতে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও নিখিলেশের চরিত্রের যে আদর্শবাদ ও নরনারীর মুক্ত সম্পর্কের ধারণার ইঙ্গিত রয়েছে তা কতকটা কমলেরও, যদিও নিখিলেশ কমলের মতো anarchic নয়। এবং সন্দীপ যখন বলে 'আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার', তখনও কি সেই কথার অনুরণন কমল পর্যন্ত বর্তায় না? ইব্‌সেনের নোরা অথবা গলসওয়ার্দীর আইরিন অথবা ফ্লবেয়ারের মাদাম বভারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের চরিত্র হলেও যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় সকলে জ্বলে পুড়ে মানবিক মূল্যবোধের রকমফের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রও সেই ঐতিহ্যেই লালিত। নোরার মতো স্পর্ধিত উত্তর[৩] সে না দিতে পারলেও তার নারীত্বের অন্তঃসার-শূন্যতার কথা জানাতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। ঈর্ষায় সে জ্বলেছে, বিহারীর প্রতি তার প্রচণ্ড আকর্ষণকে সে বিন্দুমাত্র অন্যায় বোধ করেনি, এমন কি তাকে স্বামীর আসনে বসিয়ে মনে মনে পূজা করেও নীতিভ্রষ্টতার কথা তার মনে আসেনি। পরবর্তীকালীন রচনা 'চার অধ্যায়' বা 'শেষের কবিতা'র আধুনিকতা অবশ্য অন্য স্তরের। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে আমরা যেমন নরনারীর সম্পর্ককে সহজ করে নিতে শিখেছি, তারা যে বৃহৎ সমাজের দু'টি পরিপূরক অংশ, শুধু ঘরে নয়, বাইরেও, সংসারের শান্ত পরিবেশে নয়, কর্মজগতের অস্থির কোলাহলেও, এলা ও অতীন তার নিশ্চিত উদাহরণ। শুধু তাই নয়, এই দু'টি নরনারীর প্রেমের রোমান্টিকতায় পুরোনো কালের ঐতিহ্য কিছুমাত্র নেই, অতীনের সামনে এলা বুকের অন্তর্বাস খুলে ফেলতে দ্বিধা করে নি,—সে কথাও লেখক অসংকোচে বলতে পারলেন এবং অতীন যে দোলাচল-চিত্ততার জন্য এলাকে গ্রহণ করতে পারলে না সেও সম্ভবত আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রেরই প্রতিফলন মাত্র।

আধুনিককাল গোপনে লেখকের মনে যেসব রেখাপাত করেছে 'ঘরে বাইরে' গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে।—রবীন্দ্রনাথ

৩ স্বামীর সংসারে নোরা সুখে আছে কিনা এ-প্রশ্নের উত্তরে সে স্বামীকে বলতে পেরেছিলো: No, never, I thought I was, but I never was এবং পরে বলেছিলো, Before all else (being a wife and mother) I am a human being.
—A Doll's House.

৪

বিগত দু'তিন শতাব্দী ধরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে ভারতে, বিশেষত বাংলাদেশে যে নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠলো তার ফলে এদেশের বহুদিনকার জড়ত্ব যেমন একদিকে খসে গেলো, অন্য দিকে তেমনি যা কিছু য়ুরোপীয় তাকেই নির্বিচারে গ্রহণ করা হতে থাকলো। এবং এই গ্রহণের ফলে কিছু সংখ্যক লোক, হিসেবে যদিও নগণ্য, ইংরেজী, কখনো বা ফরাসী শিখে, জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য শিল্পের তালিম নিয়ে সাধারণ লোকের থেকে এক সাংস্কৃতিক দূরত্বের অমোঘ ব্যূহ রচনা করে বাস করতে লাগলেন।[৪] তারাই এদেশে আধুনিক বলে পরিচিত। তেমনি-ভাবে নিজ নিজ সময়ে রামমোহন, মাইকেল, ঠাকুর পরিবারের অনেকেই শুধু আধুনিকভাবাপন্ন নন, এমন একটি জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলেন, একটি বিশেষ রুচি ও মননশীলতার অধিকারী হলেন যার সঙ্গে রাম শ্যামের আকাশ পাতাল ফারাক। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই সাংস্কৃতিক বংশ-ধরেরা আর দশজনের উপর সামাজিক আধিপত্যও বিস্তার করে আসছেন। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ যাঁরা প্রাজ্ঞ, সংস্কৃত পড়ে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত করে পরিশীলিত ভাবধারার প্রচার প্রসারে কৃতসংকল্প হলেন। রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ তেমনি ঐতিহ্যের বাহক বলে আজও নন্দিত। ভালো অনেক কিছুই এলো, তার সঙ্গে এলো যা মন্দ, হয়ত বা যা ভারতীয় চিন্তার বিরোধী, যা বাংলার জলমাটিতে অস্বাস্থ্যকর। আমরা সাধারণ লোকেরা তাই গ্রহণ করলুম নির্বিচারে, আধুনিকতার খাতিরে। উনিশ শতকে উপর শ্রেণীর সামাজিক জীবনে এর যেমন বিরূপ প্রতিফলন দেখেছি তেমনি দেখেছি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ত্রিশের যুগে অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু শ্যাওলা যেমন প্রবল স্রোতের মুখে জড়িয়ে

৪ সঙ্গীতই একমাত্র ব্যতিক্রম যা এখনো অবিকৃতরূপেই ভারতীয় রয়ে গেছে। ইদানিং রবিশঙ্কর প্রভৃতি যদিও দু'একজন সুরকার এবং অতীতে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন হারমোনাই-জেশন্ এর প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা আশানুরূপ ফলদায়িনী হয়নি ; রাগরাগিণী তার সুর ও ভাব গাম্ভীর্যে এখনো ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। ঠাকুর পরিবার অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলেন।

থাকে না, ভেসে যায়, বাংলা কবিতা, উপন্যাস ও ছোট গল্পের আবর্জনাও তেমনি প্রতিভাশালী স্রষ্টার হাতে পড়ে দূর হোলো,—কবিতায় তার স্বাক্ষর রাখলেন জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে, উপন্যাসে এলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ছোট গল্পে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, শৈলজানন্দ প্রভৃতি। সর্বোপরি, প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষায় যে ঐতিহাসিক দিক নির্ণয় করলেন, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তখন মধ্যগগনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও, তাকে স্বাগত করতে দ্বিধাবোধ করলেন না। বহু বাগ্‌বিতণ্ডা সত্ত্বেও অজস্র প্রতিরোধ ও উপেক্ষা সহ্য করে বীরবলের ক্ষুরধার রচনা সেদিন বাংলা ভাষাকে এক অনায়াস গতিশীলতা দান করেছিল যার ফলে আমরা আজ অতি সহজেই স্বচ্ছ নিরাভরণ গদ্য লিখতে শিখেছি। এমনি করে আমরা সাহিত্যে আধুনিক যুগে এসে পড়লুম।

এবং এই আধুনিকতার মূলে যেহেতু বিদেশাগত ভাবধারার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট সেহেতু য়ুরোপের চিত্তবিকাশের ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যার সূত্রপাত প্রথমে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন্‌ ও নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে এবং যার চরম প্রকাশ প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে। এদেশে তার প্রভাব প্রত্যক্ষ নয় এবং পরোক্ষ হলেও বাংলা সাহিত্যে ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার অবদান, ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে, বহুমুখীন্‌।[৫]

আধুনিক কবিতার ভাবধারার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন সমালোচক স্বীকার করেছেন :[৬]

> The works of the twentieth century poets in which a political thought can be found do not belong to the tradition of the great didactic and religious poems

৫ অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা সাহিত্যের এমন দৈন্যদশা উপস্থিত হয়েছিলো যে তা থেকে মুক্তির উপায় ছিলো অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণে; ইংরাজী শিক্ষার সাহচর্যে সেই ফল লাভ হল। These signs prove the decadence of the prevailing literature, and this decadence to overcome itself, needed a change: that change was to be brought about by the British influence. S. K. Dey—History of Bengali Litarature, 1800-1825.

৬ Reymond Tschumi—Thought in Twentieth Century English Poetry.

and the doctrines which can be extracted from these works can not be regarded as specifically religious, ethical, speculative, social or practical. There seems to be no universally accepted doctrine.

বস্তুত ভিক্টোরীয় যুগের শেষ অঙ্কেই প্রচলিত ধ্যানধারণা বদলাচ্ছিল; টেনিসনে যে সঙ্কেত আছে, এবং ব্রাউনিংএর কবিতায় যদিও বা আত্মবিশ্বাসী একটি সুস্থ মনের প্রকাশ আছে তা শুধু দ্বিধা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাতেই নিয়োজিত। অর্থাৎ সে যুগেই একটা অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হচ্ছিল। বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে য়ুরোপে এমন সব ঘটনা ঘটে গেলো যা ইতিপূর্বে মানুষের কল্পনাতীত ছিল। এর ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপ, আত্মঘাতী পরিণাম, সমগ্র সমাজমানসে (ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধই সম্পূর্ণ সমাজকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেনি) গভীর বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়া এবং সর্বশেষে পারিবারিক সংহতি ও সুমিতির বিনষ্টি মানুষকে পরিপূর্ণভাবেই কেন্দ্রচ্যুত করে ফেললো। স্নায়ুক্রিয়াজনিত দৌর্বল্য সম্ভবত এরই ফলস্বরূপ। সে কারণে কবিরা ট্রাডিশন থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্যুত; ধর্ম নীতি অথবা ভালোবাসার শক্তি তাদের মনে স্থৈর্য আনতে অক্ষম। সমাজ সংসারের যে ছবি এতকাল সে পোষণ করে এসেছে আরো একটি বৃহৎ নিষ্ঠুর সত্যের আঘাতে আজ তা ধুলিমলিন। মানুষকে অতঃপর নতুন করে ভাবতে হয়েছে তার জীবনের অধ্যায়, ভাব-অনুষঙ্গ যথারীতি বদলেছে—অতএব সাধারণ কোন সত্যবোধে আস্থা রাখা তার পক্ষে অসম্ভব। যেসব কবি যুদ্ধে গিয়েছেন এবং ফিরেও কবিতা লিখেছেন তাদের অভিজ্ঞতায় যেমন বেদনা আছে ততোধিক আছে ভয়ার্ত আকুলতা. কারু কারু কবিতা, পরিশ্রুত হয়ে, সার্বজনীন করুণাবোধে পর্যবসিত।

৫

তার পরবর্তীকার অধ্যায় কেবল কবিতায় দ্রুতগতি পট পরিবর্তনেরই চিহ্ন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যদিও রেনেশাঁসী সভ্যতার চরম অবদান, বিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধহীনতার যুগে তা এক নতুন রূপে দেখা দিল। সমাজমানসের সঙ্গে

এক নিয়ন্ত্রিত যোগ সাধনের ফলস্বরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একদিকে যেমন আত্ম-সচেতন মনোভঙ্গীতে পরিণত হ'ল, অন্যদিকে এল সমাজ চেতনা। শিল্প সাহিত্য এই দুই টানাপোড়েনের ফলে দুটি বিচ্ছিন্ন বিপরীত মার্গ অবলম্বন করল। এই দুই পন্থার সমন্বয় রজার ফ্রাইএর বিবরণে যদিও মেলে, তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই—ব্রাইন জোনস্ তার Integration of Poetry পুস্তকে যে কথা বলেছেন—যে, সকল আধুনিক শিল্পকলাই সেই যুগে 'disturbing to the generation'। বড় বড় সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণায় শিল্প সাহিত্যের বিকাশের নানাবিধ কারণ চোখে পড়ে। ফ্রেজার সাহেব মানুষের বিভিন্ন সময়কার অনুভূতিগুলির magic synthesis-কে শিল্পের প্রস্তুতি বলে ধরেছেন। মালিনোয়াস্কি শিল্পচর্চার ইতিহাসকে মানুষের আদিম সমাজব্যবস্থা থেকেই বিচার করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাসের চেয়ে মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ওপরেই বেশী জোর পড়েছে। এমন কি বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও হোয়াইট্‌হেড প্রতীক এবং অঙ্কসূত্র নিয়ে যে দার্শনিক গবেষণা করেছেন তাও পরোক্ষভাবে এ সকলকে প্রভাবিত করেছে বলে তিনি মনে করেন।[৭] অতএব আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও তার ক্রমপরিণতির ধারা যে নানাবিধ জটিল সূত্রাবলীতে আবদ্ধ তাতে আর আশ্চর্য কি! একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই উনিশ শতকের শান্ত, স্তব্ধ প্রায়-বিষণ্ণ প্রকৃতি এখনও অপরিবর্তিত থাকলেও মানুষ নিজে স্থির থাকেনি। উপদ্রুত মন নিয়ে সে নানা দিকে নানা অন্বেষায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। প্রকৃতিচর্চা যে বিলাসের উপকরণেরই সামগ্রী এমন কথা মনে করেও অনেক কবি নাগরিক-সৌন্দর্যে আস্থা ফিরে পেয়েছেন। লণ্ডনের ব্রীজ অথবা প্যারিস প্রান্তবর্তী সেইন নদীর দৃশ্যে, কলকারখানার ধূলিমলিন অঞ্চলে অথবা সৌখীন পাড়ার রেঁস্তোরাতে, অন্যদিকে বিপ্লবে, যুদ্ধে, হত্যায়, বোমাবর্ষণে, মানুষের দৃশ্যপট বিরাট ক্যানভাসের মতই প্রসারিত হতে চলেছে। অভিজ্ঞতার চরম মূল্য হয়ত তাকে দিতে হয়েছে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে একালেই অর্জিত; বিশেষত এ অভিজ্ঞতাকে কল্পনা-প্রবণতার দ্বারা রঙ চড়ানো যায় না। এ এমনই সত্য, এত ভয়াবহ, জীবনের

৭ **The problem of meaning in primitive language—A supplement by B. Malinowsky to the Meaning of Meaning by Ogden and Richards.**

সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্রে এমনভাবে গ্রথিত! সুতরাং শিল্পীকে কবিকে একদিকে যেমন বহির্বিশ্বের দিকে চোখ মেলে রাখতে হয়েছে অন্যদিকে একান্তই অন্তর্মুখীন প্রজ্ঞার পর আত্মাও ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। এই অন্তর্মুখীনতার ফল সব সময় ভালো হয়নি। মননশীলতা অবশেষে মনস্তত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব এমন কি আরো জটিল বিষয়ে নিবিষ্ট হতে হতে কাব্যস্বরূপের অঞ্চল থেকে বহুদূর সরে গিয়েছে। কিন্তু ফলস্বরূপ কাব্যের নানাদিক, ইংরাজীতে যাকে বলা যেতে পারে 'frontiers of poetry', খুলে গেছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে নানাবিধ আন্দোলনের সূত্রপাত এরই ফলস্বরূপ। ত্রিস্তান ৎজারা যে দাদাইজম্ এর প্রবর্তন করলেন তাই এক যুগ পেরোতে না পেরোতেই সুররিয়ালিজমে রূপান্তরিত হোলো। আবার অন্যদিকে ফিউচারিজম্ ও ইম্প্রেশনিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উইণ্ডহাম ল্যুইস ও এজরা পাউণ্ড যে আন্দোলন শুরু করলেন তাও সমসাময়িককালে উল্লেখযোগ্য। এমন সব পরস্পরবিরোধী, এমন কি স্ববিরোধী মতবাদ এর মধ্য থেকে কবিতা কি করে বেঁচে রইলো ভাবলে অবাক লাগে। কেননা, যারা ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, যারা মানুষের মূল্যবোধে আস্থাবান তারা এতে বিভ্রান্ত হবেন। প্রতীকী আন্দোলনই সে সময় অবশ্য সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিলো এবং এখনও পর্যন্ত ব্লেক ও ইয়েটস্-এর সূত্র ধরে য়ুরোপীয় কাব্যে এইটেই সবচেয়ে প্রভাবশালী আন্দোলন। একদিকে যদিও য়ুরোপের কাব্য-ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বোদলেয়ার, মালার্মে ও র‍্যাঁবোর কবিকৃতিতে উজ্জ্বল, অন্যদিকে অব্যবহিত পরবর্তী যুগেই প্রতীকীবাদী ল্যফার্গের আবির্ভাব যার আলোচনা প্রসঙ্গে এডমণ্ড উইলসন্ প্রতীকী কাব্যের মূলসূত্র বিবৃত[৮] করে গেছেন। আজকের দিনে, এ শতকে দুটো বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে, য়ুরোপে এবং এদেশে, অনেক কবিই এদের কাব্যকলায় শুধু মুগ্ধ নন, নিজেদের কাব্যকে সেই আলোয় উজ্জ্বলতর করায় প্রয়াসী! আধুনিকতা যে রবীন্দ্রনাথের কথায় সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে, সেকথার সত্যতা আমরা এবম্বিধ কারণে জানলুম এবং সেই একই কারণে এলিয়ট রেষ্টোরেশন যুগকে নতুন মূল্য দিলেন,

৮ The symbolist instead of attempting to reduce an earnestly elusive sensation to the lucidity of simple language invents for it a vocabulary and a syntax as unfamiliar as the sensation itself.

ড্রাইডেনকে মর্যাদা দিলেন, কেননা ইতিহাসের পথ আবর্তিত এবং তেমনি আবর্তিত মানুষের ধ্যানধারণা, রুচি ও শিল্পবোধ। তবু যেহেতু এমন কিছু মনুষ্যচরিত্রে আছে যার ফলে সকল দেশের সকল কালের সভ্য মানুষ নিজেদের একই যোগসূত্রে গ্রথিত করেছে, একই রকম দুঃখশোকে অভিভূত হয়েছে, ভালোবাসায় ঘৃণায় ঈর্ষায় জলেছে, সেহেতু তার সৃষ্ট সাহিত্যে তেমন কিছু চিরকালের সম্পদ থাকবে যা নানা আধুনিকতার স্তর অতিক্রম করেও টিঁকে যাবে, কখনোই অপাংক্তেয় হবে না :

> Meanwhile of course, poetry is there in the shadows, secure from our definitions and explanations, in appearance an almost autonomous faculty, in operation posing as communication. To those who practise her she appears ennobling and exasperating.
>
> (Lawrence Durrel—Key to Modern Poetry.)

৬

উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করতে হোলো বস্তুত তা বর্তমান সভ্যতার মর্মকথারই প্রতিফলন এবং আমাদের দেশে এর সকল ঢেউই সঞ্চারিত হতে হতে এসেছে। সকলের আগে রবীন্দ্রনাথই আবার এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যদিও তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তিনি এই বিরাট পরিবর্তনকে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দেননি, এর সত্যরূপকে চিনবার চেষ্টা করেছেন ; নিজের জীবনের পরিবেশ থেকে এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা হলেও তাকে যথোচিত মূল্য দেবার প্রয়াস পেয়েছেন, এবং সর্বশেষে একথাও স্বীকার করেছেন, এরকম সর্বাত্মক হাওয়া-বদল যদি সমাজ জীবনে অথবা রাষ্ট্রবিপর্যয়ে হয়ে থাকে শিল্পে সাহিত্যে তার প্রতিরূপ দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু তা যে সুস্থ নয়, তার প্রকাশ স্বাভাবিক নয় সে কথারও ইঙ্গিত দিতে ভোলেন নি :

> গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিলো, তার বহুযুগ প্রচলিত আদব ও আব্রুতা সাংঘাতিক সঙ্কটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেলো, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত

বিশ্বাস করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেলো, মানুষ যে সকল শোভন রীতি, কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিলো তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র বলে জানতো তাকে দুর্বল বলে আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় বলে অবজ্ঞা করতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগলো। —রবীন্দ্রনাথ

প্রকৃতপক্ষে এই উগ্রতা রবীন্দ্রস্বভাবের পরিপন্থী এবং সম্ভবত যে জীবনচর্চায় সুমিতি ও কল্যাণবোধের পরিচয় নেই, যা ঐতিহ্যবোধকে যথোচিত মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে তাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাঁর আধুনিকতার প্রতি বিদ্বেষভাবজনিত নয়, বরং সার্বিক সুস্থ জীবনচেতনায়, সুসম আদর্শে বিশ্বাসী বলেই তিনি একে অসুস্থতার লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন। একদিক থেকে তার এই সমগ্রতাবোধ, গভীর দর্শনচিন্তার ভিত্তিতে মানুষের জীবনের রূপকল্প এ শতকের সর্বশেষ মতবাদকেই সমর্থন করে।[১] তিনি এ প্রসঙ্গেই, আমাদের দেশের তৎকালীন দু'একজন অতি আধুনিক উগ্রবাদী কবিপ্রসঙ্গেই সম্ভবত বলেছিলেন, অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তাল ঠোকাই আধুনিকতা। তৎকালীন ইংলণ্ডের কাব্যচর্চার বিষয়ে তাঁর যে অপরিমিত উৎসাহ ছিল, 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি তার প্রমাণস্বরূপ। এবং এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করতে তিনি যেমন উৎসাহ বোধ করেছেন তেমনি সুপ্রাচীনকালের চীনদেশীয় কবি লি-পোকে আধুনিক আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন বিশেষ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করলেই তৎকালে আধুনিক বলে স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। একথা তো আমরা জানি, এখনো বাংলা দেশে এমন অনেক কবি আছেন, নিরলস কাব্যচর্চা থেকে যাঁরা বিরত হননি, অথচ সমালোচনার মানদণ্ডে যাঁদের ঐতিহাসিক কালনির্ণয় হবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এতে অবশ্যই তাদের গুণাগুণের উপর কোন ইঙ্গিত করা হচ্ছে না, তবে যুগধর্মের সকল বিশিষ্ট লক্ষণ যদি কোন কবিতে না বর্তায় তবে বৃহৎ কালধর্মের চিরকালীন

১ Except on the basis of a philosophy embracing the *totality of existence* all approaches to the problems of individual as well as social life are bound to be misleading.

—M. N. Roy : Reason, Romanticism and Revolution, Vol. II.

সুরটিও কি তাঁর পক্ষে অনায়াস-লভ্য হবে? রবীন্দ্রনাথ নিজেও কাব্যবিচারে এমন সব প্রশ্ন তুলেছেন। একালের কাব্যধারার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও, এই পরিবর্তনকে অভিনন্দিত করেও তিনি এমন আশঙ্কা করেছেন যে, এ সকল সৃষ্টির অনেকখানিই প্রস্তুতি হিসাবে কালের বিচারে বরবাদ হয়ে যাবে, কেননা তিনি জানতেন পরম ও চরম উপকরণে আকাশপাতাল তফাৎ। 'তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকা-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।' চরম উৎকর্ষ সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'ডাডাইজম্‌' (সাহিত্যে নবত্ব—সাহিত্যের পথে) সে কারণে আজ আর য়ুরোপীয় সাহিত্যে ডাডাইষ্টদের প্রভাব নেই। এমন কি চল্লিশের কবিদের কাছেও তাদের কোন মূল্য ছিল না। আয়ুষ্কাল যে তার এত ক্ষীণ সে কথাও রবীন্দ্রনাথ তিরিশের গোড়াতেই বুঝেছিলেন এবং সেকারণে আজ য়ুরোপীয় কাব্যকলায়, বিরাট প্রতিশ্রুতির লক্ষণ না দেখলেও, আবার ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবপ্রকরণেরই সাক্ষাৎ পাচ্ছি, উনিশ শতকের ফরাসী ও জর্মন কবিরা ক্রমশই আবার এমন সর্বাঙ্গীণ অনুমোদন লাভ করছেন।

বাংলা ১২৯৮ সনে রবীন্দ্রনাথ কবিতা-বিষয়ে যে ধারণা পোষণ করতেন তার পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে বাংলা ১৩৪৩ সনেও প্রায় অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রথম রচনাটি এরূপ: "যখন আমি নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্ক বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রকেই জানি, কিন্তু যখন নক্ষত্রকে সুন্দর বলিয়া জানি তখন নক্ষত্র-লোকের মধ্যে আমার আপনার হৃদয়কেই অনুভব করি। এইরূপে কাব্যে আমরা আমাদের বিকাশ উপলব্ধি করি।" (১) দ্বিতীয় রচনাটি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে প্রকাশিত: ইংরেজীতে যাকে বলে রীয়ল, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে, 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম' জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শীলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়, সে অসুন্দর হলেও মনোরম; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।......মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে।' প্রথম গদ্য রচনাটির মাত্র একমাস পূর্বে 'সোনার তরী' কবিতাটির রচনাকাল বলে কবি 'চয়নিকা'য় উল্লেখ করেন এবং 'সাহিত্যের পথে'র প্রকাশকালের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বলাকা-পর্ব শেষ হয়ে যায়। ১৩৪৪ সনে তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ, যে সময় থেকে অনেকে তাঁর কাব্যধারার শেষ পর্যায়ের সুরু মনে করেন। অর্থাৎ এই দীর্ঘ দিন নিরবচ্ছিন্ন কাব্য ও সাহিত্য চর্চা করে কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মূলগত ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি; বিশেষ করে, রবীন্দ্রকাব্যের যে প্রচণ্ড সত্য তা আমাদের একান্তই জড়বাদী মানসিকতা ও তার্কিক বাচনভঙ্গীকে যেন অনায়াসেই ম্লান করে, এবং সেই প্রচণ্ড সত্যই 'সোনার তরী' থেকে 'বলাকা'র কবিতাবলীতে বিধৃত ও বিস্তৃত। সুতরাং কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য ও বর্ণনাকে তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া অসমীচিন

---

১ সাহিত্য; পৃঃ ২২৯

হবে না। শুধুমাত্র কাব্য নয়, নাটক, বিশেষত রূপকনাট্য, গীতিনাট্য, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস বা সকল সাহিত্যকর্মেই যে মানসিকতার ছায়া পড়ে তা প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই সুসম্বদ্ধ সুপরিণত, সম্ভবত মোহমুক্ত মনের বিচিত্র প্রকাশ। যা সংযত, যা সুস্থিতির পরিচায়ক, যা স্পর্দ্ধা ও দুর্বিনীত আচরণ ও এবম্বিধ মানসিকতার বিরোধী, যা বিনয় ও শিক্ষাপ্রসূত সংযম, যা দীন অথচ দীনতার নামান্তর নয়—তাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা, কাব্যে গানে নাট্যেই হোক, উপন্যাসে প্রবন্ধাবলীতেই হোক। মানবিকতার এই সাধু সংযম, ঔদ্ধত্যের পরিপন্থী এই সরল বিনয়নম্রতা, সত্য সাহসিকতার দুরন্ত শক্তি—এই তার আশ্চর্য পৌরুষের শিক্ষা। খণ্ড খণ্ড ভাবে তার কোন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, কোন তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে তার পরিমাপ আরো অবান্তর। সমগ্র মানুষটির এই যে পরিচয় তাই তার সুবিস্তৃত সাহিত্যকর্মকে প্রভাবান্বিত করেছে, সেই পরিচয়ই তার কাব্যে, গানে, নাটকে অবিকৃত ধরা রয়েছে। জীবনব্যাপী দুস্তর কর্মপ্রবাহে নিজেকে নিমগ্ন রেখে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন তাই বার বার প্রতিফলিত হয়েছে, 'অনুভব' ও 'উপলব্ধি' অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং সেই অভিজ্ঞতা মানব-জীবনের বিভিন্নমুখিতা থেকেই—এবম্প্রকার চিন্তা ও ধারণা তাঁর সাহিত্য আলোচনায় অপ্রচুর নয়। পরন্তু এই নিছক অভিজ্ঞতারও চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি কি হতে চেয়েছিলেন, কি বিশ্বাসভরে আলোর দরজা উন্মুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন, তার কবিকর্মের বিচারে সে কথাই সমধিক মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিষয়ক চিন্তা ও তার কাব্যরচনায় কোন বিরোধ নেই, বস্তুত সকল সম্ভাব্য বিরোধ অতিক্রম করে সামঞ্জস্যের দিকে একমুখী যাত্রাই তার সাধনার প্রথম পর্যায়। সুতরাং একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, যে অভিজ্ঞতায় মানুষ বড় হয়ে ওঠে, যে পারিপার্শ্বিকের অবিরত ছায়ায় তার চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠে, তার চিহ্নই থাকবে তার রচনায়, কেননা 'অভিজ্ঞতা' শেষ কথা না হলেও, প্রথম কথা তো বটেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণনায় বাস্তবচিত্র যে তার ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। তিনি যদি মেনকার চরিত্রে তৎকালীন গৃহস্থ

বাঙালী দুঃস্থ ঘরণীর চিত্র[১] আরোপ করেন অথবা উনবিংশ শতকের কবি র‍্যাঁবো যদি নারকী রাত্রির বর্ণনা করতে সক্ষম হন (আর 'বসন্ত এনে দিলো আমায় নির্বোধের বীভৎস এক হাসি'—অনুভূতির এমনতর বৈপরীত্য দেখি তার কাব্যে) তাহলে সম্ভবত তারা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করেছিলেন বলে মনে হবে, নচেৎ এমন সাহসিকতা কোথা থেকে এল? সুতরাং যিনি বিরাট ঐতিহ্যে লালিত পালিত, ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত, সুউচ্চ আদর্শবোধে উদ্বোধিত, ধর্ম ও মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তার সাহিত্যকর্মে 'শুভ্র মানবিকতা'র ব্যাপ্তি লক্ষ্য না করে কি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিধ্বস্ততা দেখবো? যাঁর জীবনে আনন্দের সাধনা, তার কাব্যে আর্তনাদের কাতর চিৎকার কি করে সম্ভব? তা থাকবে না বলেই কি তার সাহিত্যের ভিত্তিভূমি অত পল্‌কা, নিমেষে ধূলিসাৎ হবার যোগ্য মনে করতে হবে? এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা সমীচিন এবং কাব্য আলোচনায় তার উৎস-সন্ধান করতে গেলে এ প্রশ্নের অবতরণিকা স্বাভাবিক।

কাব্যবিচারের বিভিন্ন মাপকাঠি স্বীকার করেও মানতে বাধ্য হই, একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবোধই কবির চরম উপকরণ। এই সামঞ্জস্যবোধের নির্দেশ কবির মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই এই প্রতিক্রিয়া পাঠকের প্রতিক্রিয়া নয়, যা রিচার্ডস্[২] বর্ণনা করেছেন। সমাজ-জীবনে মুক্তির এবং ব্যক্তিজীবনে বন্ধনের টানাপোড়েন—এই দুই আপাতবিরুদ্ধ অথচ সীমিত আবহাওয়ায় কবিতার জন্ম। কবিতা বিরাট ও দ্বন্দ্বময় জীবনের মহৎ স্বাক্ষর। একটি অনন্ত, অসাধারণ বোধ নিয়তই কাজ করে, একটি অস্পষ্ট ধূলিমলিন, অথবা হয়তো ভাস্বর কাব্যলোক কবির সন্ধানে একদা আসবে,

[১] মেনকা পার্বতীকে বলছেন :

প্রভাতে খাইতে চাহে কার্তিক গনাই
চারি কড়া সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই।…
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাববাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বার মাস।…
নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত
রাজ্যে বাড়্যে দিতে মোর কাঁখে হৈল বাত।

[২] I.A. Richards : Principles of Literary Criticism pp. 117 (1938 ed).

যদি বা তা একান্তই মারিতেন বর্ণিত[৪] কাব্যের রূপের সঙ্গে না মেলে, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিকে, নীতিগত অনুশাসনকে (ব্যক্তিগত অবশ্যই) একটি বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। আর শিল্পলোক অদৃশ্য কল্পজগত নয়, দৃশ্য বিশ্বলোক, স্থান অন্তরলোক; সময় এখানে অখণ্ড, পরিবর্তনশীল; চেতনা জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহচর্যে উদ্দীপ্ত। অতএব কবিতার সাযুজ্য সমগ্রতায়; পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ। অবশেষ আনন্দে। শিল্পীর আনন্দ জীবনের আনন্দ, সুখ ও দুঃখের মিলিত ধারায়; অন্যায় থেকে ন্যায়ের, অধর্ম থেকে ধর্মের শাসনে, সমাজ ঐতিহ্যের মুক্ত প্রাণনায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা: 'যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার।' এই বক্তব্য আরো একটু সম্প্রসারিত করে বলা চলে, ব্যক্তি-মানুষের জীবনে অনবরত দু'টি ধারা কাজ করছে। তুলনা দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, নদীতে পলি পড়বার মত আর পার ভাঙবার মত। একটি বিশ্বপ্রকৃতি—চারিদিকে দৃশ্য বস্তুর, গাছপালা পাহাড় নদীর, আকাশ নক্ষত্র সমুদ্রের ভালোবাসা,—বিস্ময়ে, কখনও মগ্ন চৈতন্যের দূরকল্প অনুভূতি; অন্যদিকে লোকালয়, শহর বন্দর গ্রাম, হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময়, সুখ দুঃখে, ঐক্য অনুভূতিতে, মানুষে মানুষে অভ্রান্ত যোগাযোগে চিরকালীন মূল্যবোধের স্বাক্ষর, নীতির, সংযমের শিক্ষা; একদিকে চঞ্চল দুর্বার প্রকৃতির বিমূঢ় হর্ষ, অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশে প্রতিবেশী মানুষের মানবিক ব্যবহার। মুগ্ধ আত্মস্থ মানুষই দায়ে দাক্ষিণ্যে স্বাস্থ্যবান, প্রেরণায় প্রাণবন্ত। এই যুগ্মধারাই কবির অন্তর্নিহিত প্রেরণার মূলীভূত কারণ, কাব্যজিজ্ঞাসার প্রথম উত্তর। যেখানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির দোরগোড়ায় উপস্থিত, সেখানে তার সামাজিক সত্তা নিষ্ক্রিয়, স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত, তখনি সে বিস্মিত; যেখানে সে অন্তজনার বৈঠকখানায়, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যের মূল্য। ব্যবহার, নীতি, উৎকর্ষ হৃদয়ের; বিভিন্ন মূল্যবোধে তার ব্যক্তিসত্তা শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত। অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক মূল্যবোধ—এমন একটি অবস্থাকে সুস্থ চিন্তায় স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি,—নিয়ে কাব্যবোধে আস্থা রেখেছেন।

৪ Maritain: Art and Poetry: poetry is the heaven of working reason.

উপরি-উক্ত বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য মিলিয়ে মিলিয়ে পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য কোথায়, কোন জমির ওপর তাঁর রচনা এত সহজে দাঁড়িয়ে আছে, কি করে এমন সংগতি তিনি অর্জন করলেন। তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে বিরত থাকলুম, উৎসাহী পাঠক সে কাজ অনায়াসেই করে নিতে পারবেন। এবং এ তথ্যের সত্য ততদিনই স্বীকৃত থাকবে যতদিন মানুষ তার সামাজিক, সাংসারিক সভ্যতার চিহ্ন ধারণ করে চলতে পারবে।

তাঁর সাহিত্য দ্বন্দ্ববিরল, বিরোধ সেখানে অনুপস্থিত, যন্ত্রণার হাহাকার নেই এমন কথা ওঠা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কে জানে সেই দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও হাহাকারের অস্তিত্বকে নিশ্চিত চারিত্র-শক্তির গুণেই আদর্শগত ঐক্যে পৌঁছুবার আজীবন কর্মসাধনার অধ্যবসায় দ্বারাই, নিজের জীবনবোধের অখণ্ডতার মধ্যেই আত্মসাৎ করে নেন নি? কে জানে, ব্যক্তিগত ঐকান্তিক দুঃখ, তীব্র বেদনাবোধ ও অসহ যন্ত্রণাকে নিরন্তর জ্ঞান ও বুদ্ধির শানিত অস্ত্রে পোষ মানিয়ে নেন নি? বস্তুত, সাহিত্যকর্মই রবীন্দ্রনাথের কাছে একমাত্র সত্য ছিলনা, তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল জীবনবোধ। ক্রমশ সার্থক, ক্রমশ পরিপূর্ণ জীবনের সাধনা যিনি করেছিলেন, কর্ম ও জ্ঞানের যুগ্ম শাসনে যিনি ব্যক্তিজীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর কাছে, আমার মনে হয়েছে, সাহিত্যকর্মের চাইতেও জীবনধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই মহত্তর শিল্পসাধনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে, নচেৎ শান্তিনিকেতন গড়ে তোলবার যুক্তি কোথায়? যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তিনি যে জেনেছেন, তাকে যে নারীদেহ আকর্ষণ করেছে তার প্রমাণ রয়েছে:

...তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে-মন জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা স্বীকার করেছে, ইন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছাচারিতা নয়, ইন্দ্রিয়ের সংযত শাসনই মনুষ্যত্ব, সে-ই কবিতাটির শেষ ক'টি পংক্তিতে উচ্চারণ করেছে :

পরক্ষণে ভূমি-পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

সমস্ত জীবনভ'র রবীন্দ্রনাথ এভাবে বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে প্রতিনিয়তই সাবলাইম-এ নিয়ে গেছেন; বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের এইটেই দ্বন্দ্ব, এইটেই বিরোধ।

২

এবার পরিণতির কথা। 'নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত, তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে। তাহা অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।" রবীন্দ্রনাথের এবম্প্রকার অনুভবের মূলে তার বিচিত্রসন্ধানী মনের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সরলীকরণের প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। সুতরাং রীতিবাদী পণ্ডিতদের বিচারে তিনি অদূরভবিষ্যতে নস্যাৎ হাতে পারেন এ হয়ত অনুমেয়। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বামন-প্রদর্শিত কাব্যের গুণাগুণ বিচারে এই-ই সম্ভবত আধুনিক সমালোচকদের আদর্শ, কিন্তু এ আদর্শই একমাত্র নয়, সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের শেষ বিচারে রসবাদ, পরিশেষে ধ্বনিবাদই স্বীকৃত হয়েছে এবং আনন্দবর্দ্ধন যখন কাব্য-অবয়বে অতিরিক্ত লাবণ্যের কথা বলেছেন তখন রবীন্দ্রনাথের উপরের উদ্ধৃতি আমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হয় না। রবীন্দ্রকাব্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় পাই তা বিষয়ের মূল্যবোধ নয়, ত আদর্শবোধের মূল্য—যা নিয়তই মঙ্গলের দিকে ধর্মের দিকে চিত্তবৃত্তিকে এগিয়ে দেবে। যে বস্তু-জগতের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কারবার সেই সূত্র ধরেই কাব্যের বস্তু তাকে আরো গভীরে নিয়ে যাবে; রসবাদের সূত্রপাত এখানেই। এ গভীরতার কোন মাপকাঠি নেই, হিসেবের কোন অঙ্কও সম্ভব নয়। তানপুরার চারিটি

তারে ধীরে ধীরে আঘাত করলে যেমন সম্পূর্ণ সপ্তকই, কড়ি কোমল সহযোগে, সুগায়কের কানে ধরা পড়ে, মানুষের মনের বিভিন্ন ভাব অনুভাব বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে তেমনি সকল সম্ভাব্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন সৃষ্টি হতে থাকে রসলোকের ব্যাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রকাশ আশ্চর্য সংযত ও সুনির্দিষ্ট। মনের চিত্তবৃত্তির মুক্তি, প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে মঙ্গল ও সৌন্দর্যের দিকে তার নিয়ত প্রবহমানতা। অন্যপক্ষে, কবিতার আবেদন যে রাস্তা ধরে পাঠকচিত্তে প্রবেশ করে, সে রাস্তাও সোজা নয়, বৃত্তাকার। বিভিন্ন প্রেরণা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কত বিভিন্ন অনুভূতির পারস্পরিক সমন্বয়ে যে প্রান্তিক চেতনাবোধ পাঠকের মনে রসলোক সৃষ্টি করে তা স্বভাবতই বার বার ঘুরে ঘুরে প্রতিফলিত হয়; একের আঘাতে অন্যের, কখনো বা সমন্বয়ে সবগুলি অনুভূতির নানা রকমফের হয়। এভাবেই কবির উপলব্ধি পাঠকের ঐকান্তিক অনুভূতির কাছে সহানুভূতি লাভ করে, কেননা রস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। বহু বিষয়ে বিভিন্নতা থাকলেও, ব্লেক সম্পর্কে তার অন্যতম সমালোচক যা বলেছেন[৫] রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা হিসেবে তা উল্লেখযোগ্য। কবির গানের একটি পংক্তি ধরা যাক:

> তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
> প্রভু আমার জীবনে।

শুধু এই সুরের প্রভাবেই নয়, আরো 'গোপন' জানাজানির মধ্য দিয়ে যে সম্পর্ক 'প্রভু'র সঙ্গে তার স্থাপিত হয়েছে তা স্পষ্টতই কবির একান্ত আপন নিবিড় সত্তা। যে মন প্রাত্যহিকতার মধ্য থেকেই আবার প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, সে মন এই রসের সন্ধান জানে। তার কাব্যে সে কারণেই একটি অতিরিক্ত লাবণ্যের আভাষ পাই। কেননা এখানে ভাব কোন বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, যে সহৃদয় পাঠকচিত্তই কাব্যরসের আঁধার সেখানেও এক বিশুদ্ধ তন্ময়তা জন্মলাভ করেছে, স্থায়ী ভাব সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রসের আস্বাদন এনে দিয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা কাব্যসংসারে কবিকে

---

৫ Max Plowman: "Introduction to the Study of Blake" Blake's theme was the soul of man. From the 'Songs of Innocence' to the 'Ghost of Abel' his aim was to reveal the nature of the soul. He further believed that all things existed in Eternity.

প্রজাপতির আসন দান করেছেন, শব্দ-অর্থের পূর্ণ মিলন এবং তজ্জাত গভীর ভাববহতাই অতিরিক্ত লাবণ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী—এই বোধ হাজার বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারাকেও নতুন জারক রসে সমৃদ্ধ করেছে।

যে-অভিজ্ঞতা এবং অবশেষে উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ তার আজীবন কাব্যসাধনায় বলে গেলেন, বস্তুত তার নিজেরই কাব্য যে তত্ত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, তার জীবদ্দশাতেই বাংলা কবিতার এক নতুন সন্ধিক্ষণ তিনি সম্ভবত সংশয়াকুল মনে লক্ষ্য করে গেলেন যা শুধুমাত্র উপলব্ধির পরেই নির্ভরশীল রইলো না, বরং এক বিচিত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর 'চেতনা'ই যার প্রাণস্বরূপ বলে আমাদের মনে হতে পারে। এবং এই কবিরা আরো বলে গেলেন, 'কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার'[৬]। এবং এ প্রসঙ্গেই কাব্যপাঠ সম্পর্কে লেখক যে উক্তি করলেন তা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য, কেননা রবীন্দ্রকাব্যের জগৎ ও চিন্তাধারার সঙ্গে এখন থেকেই এক মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়বে; 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিষ—শুধু কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।'[৭]

রবীন্দ্রনাথে এসে বহু শতব্দীর বাংলা কাব্যের যদি চরম ও পরম রূপটি দেখতে পাই, তবে জীবনানন্দে এসে সেই বাংলা কাব্যের অন্য একটি নতুন বিশেষ রূপ আমাদের চোখে পড়ে যার সঙ্গে সম্প্রতিকালের সম্ভবত সকল কবিই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করেন। সেই নতুন রূপ শুধু যে অপূর্ব চিত্ররূপকল্পনায় তা নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত সম্ভাব্য অনুভূতি থেকে উদ্ভূত সেই 'চেতনা'ই তার প্রধান সম্বল। এখন থেকে কবির চোখে শুধু কল্পনার কাজল নেই, রয়েছে 'চোখের ক্ষুধা', মনে কেবল ভাবলোকের তন্ময়তা নেই, আছে মাতৃসমা শস্যের খেতের ধারে বসে এক আকুল 'পিপাসা', [৮] 'কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী' নিছক আবেগের সঞ্চার করে না, কেননা সেইসব মুখশ্রী মাছির মত

৬ জীবনানন্দ দাশ—'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র কবির ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৭ জীবনানন্দ দাশ—অবসরের গান
৮ ঐ

ঝরে' এবং 'সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে'। জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আমাদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করে, যেমন ঘুম, ঘ্রাণ, স্বাদ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। ইংরেজী কাব্যে রোমন্টিকতার পুনরুজ্জীবন যখন বাংলা কাব্যের আসরেও তার স্থান করে নিয়েছিল তখন মানবতা, প্রকৃতি-প্রেম ইত্যাদি তার মূলীভূত বিষয় ছিল এবং কল্পনা ছিল প্রধান আশ্রয়[৯]। এ হেন রোমান্টিকবাদই রবীন্দ্রনাথেরও উপজীব্য ছিল, অথচ জীবনানন্দকে 'রোমান্টিক' আখ্যা দিলেও তার কাব্যের রাস্তা পৃথক বলেই মনে হবে। কেননা কাব্যধারণাই তার স্বতন্ত্র। এবং সেকারণেই একটি আশ্চর্য সহজ স্বাভাবিক পথ তিনি বেছে নিয়েছেন। যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথ আমাদের ও সংসারের চোখে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি বলে মনে হয়, তখন জীবনানন্দের সমগ্র মানবিক অস্তিত্ব যেন তার কাব্যের অবয়বে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, বস্তুত তার ব্যক্তিত্ব তার কবিত্বেরই একটি সংকুচিত প্রকাশ মাত্র। যদি লাসকাটা ঘরের মানুষটির রক্তের ভিতর আরো এক 'বিপন্ন বিস্ময়' কাজ করে, যদি 'জানিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম অবিরাম ভার' সহ্য করা সম্ভব না হয় তবে যে সেই সংসারে আপাত সুখী মানুষটি মৃত্যুকে বরণ করে নিলো,—এমন একটি প্রাকৃতিক ঘটনায় আমরা সম্ভবত বুঝতে পারি, এ কাব্যের সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতির রাস্তা পুরোনো রাস্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদি জীবনানন্দ দাশকে রোমান্টিক আখ্যাই দিতে হয় তবে সম্ভবত প্রাজ্ সম্পর্কে ক্রোচের উক্তি স্মরণীয় বলে আমাদের মনে হবে[১০]। বস্তুত এই 'new sensibility' বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম এমন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনিই প্রথম নিয়ে এলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করি। জীবনানন্দের কাব্যজগতের সৃষ্টির মূলে রবীন্দ্রনাথের মত বিশুদ্ধ কোন ভাব নেই, বরং রয়েছে একটি বিস্তীর্ণ চেতনা, যে-চেতনা দেহ ও মনকে সমৃদ্ধ করে, যন্ত্রণায় কাতর করে, কান্নায় আচ্ছন্ন করে, নির্দয়-ভাবে শরীরকে দাহ করে। প্রাজ্ তার 'দি রোমান্টিক এগনি' নামক বইটিতে theme of fatal woman কে যে ভাবে বিবৃত করেছেন, বিভিন্ন

৯ C. M. Bowra : The Romantic Imagination : For the Romantics, imagination is fundamental.

১০ Praz seems to make out that what is called Romanticism consists in the formation of a new sensibility.—Croce.

কবিদের রচনা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অনেকটা তেমনিই মনে হয়, জীবনানন্দের কাব্যজগতের কারণস্বরূপ সম্ভবত একটি fatal instinct বরাবর কাজ করেছে। কেননা, তার কাব্যের উপাদানে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এমন কি যেমন পশুপাখার উল্লেখ রয়েছে ইতস্তত, সেখানেও একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেন অসুস্থ, যেন মৃত্যুর সংকীর্ণ গলিপথে আমরা সবাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। জন্তুর মধ্যে নিওলিথ স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ঘোড়ার কথা, গরিলা শূকর ও হাঙর এবং ছোট প্রাণী পতঙ্গের মধ্যে ইঁদুর, ব্যাং, পেঁচা, কীট, কাঁকড়া, বোলতা ইত্যাদির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ সত্যি কি অসুস্থ জগতে নিয়ে যায় না? কিন্তু এই morbidityই তার কাব্যের শেষ কথা নয়, শেষ কথা ব্যক্তিমনের বিশেষ চেতনা এবং তজ্জাত এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান 'বোধ'। আরো একটি উক্তি করলে হয়তো এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পুরোপুরি বাংলা দেশের নিজস্ব প্রকৃতির এমন নিপুণ ঘনিষ্ট চিত্র এঁকেও তার কবিতা পড়ে কখনোই মনে হয় না, তিনি বাংলার কোন ট্রাডিশনের সঙ্গেই নিজের মানসিকতাকে যুক্ত রেখেছিলেন, বাংলা দেশের কোন প্রচলিত কাহিনী, পুরাণ, বাংলার পুরোনো দিনের কবিকর্ম, এমনকি মাইকেল রবীন্দ্রনাথ তিনি পড়েছেন বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, এতই তিনি ট্রাডিশন থেকে বিচ্যুত! সম্ভবত তিনি সুরুতেই একক রাস্তায় হাঁটতে শিখেছিলেন, কাউকে ভর করে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। সেদিক থেকে জীবনানন্দের কাব্য আমাদের কাছে এক আশ্চর্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম সংস্করণে সম্পাদকদের মধ্যে কারুর নজরেই সম্ভবত জীবনানন্দের আশ্চর্য প্রতিভার চিহ্ন ধরা পড়েনি। ভূমিকায় জীবনানন্দের কোন উল্লেখই ছিল না, বরং সে সময় তাঁরা সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যেই বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন[১১]। একথাও তাঁদের মনে হয়েছিল 'আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত'। আজকে আর সেকথা আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য নই, বরং জীবনানন্দের পরেও সেই প্রাচীন রবীন্দ্রনাথেরই কথার পুনরুক্তি করছি। কেননা দেখা গেল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিই ব্যক্তিচেতনাসম্ভূত। 'সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত;

১১ আধুনিক বাংলা কবিতা: সম্পাদনা—আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকায় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই[১২]।

৪

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতা যে নতুন রাস্তায় চলা সুরু করেছে তার প্রায় সম্পূর্ণই জীবনানন্দের একক কবিকর্মের ফল। সমর সেন বা বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে নতুনের আস্বাদ ছিল সন্দেহ নেই, তবে সে আস্বাদে চমৎকারিত্ব যত ছিল, প্রসাদগুণ তত ছিল না, 'চেতনা'র অস্পষ্টতা ছিল ততোধিক (এখানে চমৎকারিত্ব বলতে অবশ্যই সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রয়োগ অর্থে বলছি না)। উপলব্ধির স্তর থেকে চেতনার স্তরে কবিতার যে নতুন সড়ক তৈরী হলো, কল্লোল কবিগোষ্ঠীর পরবর্তী যুগের কবিরা সকলেই যেন সেই নতুন আলোকে স্নান করে নিলেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

এখানে বিক্ষত আমি, সারাক্ষণ প্রশ্নের পাথরে
মাথা খুঁড়ি, শান্তিহীন বুদ্ধির আগুনে দুই পাখা
পুড়িয়ে সর্বস্বরিক্ত[১৩]

আর সারাদিন
সারাদিন আলোর গভীর
ঢেউ এসে ছুঁয়েছিল মমতায় জড়ানো এ-নীড় ;
ধুয়ে গেছে তার সাথে যতটুকু ছিল নির্জন
তোমার হৃদয়, প্রেম, এককোঁটা রাতের মতন।[১৪]

কাল তারা চলে গেছে
জেনেছে বিড়াল, পোষা কুকুর ওদের
ঘাস শুঁকে গাছ শুঁকে, জল ছেঁচে ছেঁচে
মিলবেনা সেই ঢেউ পরমস্রোতের ! [১৫]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটি সাধারণ সত্য খুঁজে বার করা যাবে। তা

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যের পথে'

১৩ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৪ কল্যাণ সেনগুপ্ত। ১৫ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

হচ্ছে, কবিরা প্রত্যেকেই একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলছেন, দ্বিতীয়ত, অনুভূতি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, আরো কিছু বেশী, তা চেতনা নির্ভর। প্রত্যেকটি কবিতাতেই একটি বিশেষ মানসিকতার ছাপ রয়েছে, কারও কাছে তাদের হাত পাততে হয়নি প্রত্যক্ষভাবে, এও সহজেই অনুমান করা যায়; তবু কাব্য সম্পর্কে আমাদের মনে যে নতুন বোধ জন্মলাভ করেছে এই উদ্ধৃতিগুলি তারই নিদর্শন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে এই অতি সাধারণ কথা ছাড়া বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, কেননা এখনো ফসল কাটার সময় হয়নি, মাত্র বীজ বোনা হয়েছে; যাঁরা লিখছেন তাঁরা সকলেই আরো দীর্ঘ দিন লিখবেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের পর বাংলা কবিতার গতিপথ কোন্ দিকে, কাব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা কোন্ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত আলোচনা শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও বটে। তবু একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রবীন্দ্রনাথের পর কল্লোলগোষ্ঠীর কবিদের কাছে আধুনিক কাব্যের কয়েকটি লক্ষণ বিশেষভাবেই অনুভূত হয়েছিল; তার মধ্যে তাঁরা সম্ভবত প্রাজ্[১৩] বর্ণিত মিল্‌টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট'এর নায়কচরিত্রে এবং কাহিনীর মৌল তত্ত্বকথাতে Reversal of values-এরই সাক্ষাৎ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব জোর করে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে এঁদের বহুস্থানেই কাব্যের সীমা লঙ্ঘন করতে হয়েছে, কেননা কাব্য সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের এমন কোন সুচিন্তিত ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি যে ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা একান্তই নিজস্ব ভঙ্গিমাতে কাব্যচর্চা করতে পারবেন। যিনি পেরেছিলেন তিনি জীবনানন্দ দাশ এবং অত অনায়াসে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রভাবকে একপাশে সরিয়ে রেখে নিজের রাস্তায় চলতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যত, বিরাট কোন কবিক্ষমতার অধিকারী না হয়েও কল্লোলোত্তর যুগের প্রায় কোন কবিই কাব্যাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, কাব্যের সহজ প্রাণবন্ত সড়কে তাঁদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি বাংলা কাব্যের সম্ভাবনাময় ঋতুবদলের অপেক্ষায় রয়েছে।

১৩ M. Praz : The Romantic Agony

জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি প্রশ্ন

জীবনানন্দ দাশের কবিতার সহৃদয় বিচার কয়েকটি বিষয়ের যথার্থতার উপর নির্ভর করে। প্রথমত, শিল্পচর্চার যে অন্তর্মুখীন আনন্দ, আরিষ্টটল্ সম্ভবত pleasure of art বলে যা অভিহিত করেছেন আজকের দিনেও তার সত্যতা কতটুকু। অন্তর্মুখীন এইজন্য যে কবির সক্রিয় অনুভূতি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অনুভূতির 'পর নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়ত, রচনার পটুত্ব মহৎ কবিতার অন্যতম লক্ষণ বলে স্বীকৃত হবে কি না। তৃতীয়ত, কালধর্ম যে বিরাট ব্যাপ্তি ও গভীরতা সূচিত করে তার খণ্ডিত রূপ যুগচেতনার স্বাক্ষর, এই অনন্ত বোধই কবির কাব্যধারার দিক নির্ণয় করে এই বিশ্বাসে নিশ্চিত আস্থা। পরিশেষে, তার কাব্যজগতের যে বহিরঙ্গ রূপটি আমাদের চোখ পড়ে তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলস্বরূপ মাত্র নয়, কবিজীবনের যে অলিখিত ইতিহাস আমাদের অগোচরে রয়ে গেল তার সম্যক অনুধাবনও প্রয়োজন। নচেৎ একান্তই অনুভূতিপ্রবণ কোন কবির অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ সৌভাগ্যেরই বস্তু বলে সাধারণের কাছে বিবেচিত হবে।

শিল্প, সঙ্গীত ও কাব্যের বিচারে একটি অসুবিধে প্রায় সার্বজনীন। সূক্ষ্মতার বিচার ও তজ্জনিত তারতম্যবোধ এতই স্বাভাবিক অথচ ততোধিক অপরিহার্য যে নিগূঢ় ও নিবিষ্টমনা সমালোচকের কাছেও সৃজনীপ্রতিভার অসংগত দাবী রাখে। এই সৃজনীপ্রতিভার অর্থ এই নয়, সমালোচককেও কবিতা লেখবার জন্য কলম ধরতে হবে, বরং একটি সুষ্ঠু ও পরিমিত কাব্য-বোধের অধিকারী হওয়া, যে পরিবেশে উপযুক্ত চর্চা ও নিষ্ঠা-সহযোগ কাব্যসৃষ্টি অসম্ভব বলে মনে হবে না। এ দাবী এইজন্যই যে বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই গুণাবলীর অভাবে কোন কবির সত্যকার অনুভূতি অগোচরে থেকে গছে, সমা-লোচকের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বহুক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থেকেছে, সমস্ত হৃদয়বত্তার গভীরে প্রবেশপথ লাভ করেনি। যে যে অনুভূতি, যে যে চেতনা কবিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার সকল কাব্যসত্তাকে অনুপ্রাণিত করে, তার আংশিক কুশলতা সমালোচকের অধিগত থাকবে, নাহলে পাঠক ও কবির যোগসূত্র সাধনে মূলত একটি ফারাক থেকে যাবে। এবং একথা নিশ্চিত, এতে কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যবিচারের বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে উন্মুক্ত থাকলেও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বর্ণনার ভিত্তি এখনো প্রায়শ স্বীকৃত। সৃষ্টির সার্থকতা কবির আনন্দ-উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ অথবা পাঠকের মনে যথাযথভাবে সঞ্জাত হওয়ার 'পর নির্ভরশীল, এ নিয়ে প্রচুর দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ একদা নীরব কবিপ্রসঙ্গে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সে কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। কিন্তু কবির মনে যে আনন্দানুভূতি তা একান্তভাবেই তার নিজস্ব। এ অনুভূতি ব্যক্তিগত জীবনবোধের ভিত্তিতে গঠিত, মানসিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত। যদি গভীরতার প্রশ্নই আসে, যদি চেতনার অতল অন্ধকারে মনকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তবে বলা যেতে পারে, পাঠকের প্রশ্ন না এনেও কবির মধ্যে একটি অন্তর্লীন ক্রমপর্যায় ভাগ করা যায়। সে কাজ অনেকখানি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত মনস্তাত্ত্বিকদের বিচারের বিষয়ও বটে। কোন কোন সমালোচক একে Inner workings of the mental process বলেছেন; ব্যক্তি ও চারিত্রিক গঠনের পার্থক্য সম্পর্কে হার্বার্ট রীড সাহেবের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে একথা বলা অসমীচীন হবে না, অন্তর্মুখীন আনন্দলাভের দুর্জ্ঞেয় অভিজ্ঞতা কাব্যসৃষ্টির পক্ষে শুধুমাত্র সত্য নয়, কাব্যের উপকরণও বটে। যে পর্যায়ে রচনার কলা-কৌশল কবির কাছেই অধিগত থাকে ততদূর এ-আনন্দের মূল্য একমাত্র তাঁরই কাছে। পাঠকের অংশগ্রহণ এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত। অর্থাৎ পাঠক নামধেয় সম্প্রদায় কবির কাছে অনুল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ দাশই, আমার মনে হয়, একমাত্র আধুনিক কবি যার কাব্যবোধে এই বহিরঙ্গ চেতনাবোধ প্রায় অনুপস্থিত। বস্তুত, ব্যক্তিগত আনন্দবোধে তার সত্তা এতই গভীর চেতনাময় যে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি তার চিত্তকে চঞ্চল করে না। বলা যেতে পারে, তিনি বস্তুনিরপেক্ষ কবি, যিনি বস্তুবিষয়ে সচেতন, যদিচ তা তাঁর কাব্যধারণার মূল চেতনাস্রোতকে প্রভাবান্বিত করেনি। যদি নিউম্যানের কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব[১] স্বীকার করি তাহলে এবিষয়ে ভবিষ্যৎ কোন আলোচনার অবকাশ থাকেনা। সৌন্দর্যের কোন চিরন্তন প্রতিমান আছে কিনা—এবিষয় বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটিতে

---

১ Poetical mind is one full of the eternal forms of beauty and perfection.

জীবনানন্দ দাশের যে-অনুভূতি তা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সমকণ্ঠ দাবী করে না। অথচ চেতনার কয়েকটি উজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে রসের গভীরে উপস্থিত হতে হয়।

অনেক কমলালেবু রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির পল্লব ছিল অনেক

কমলালেবু রঙ এর রোদ একান্তই সম্ভব কিনা অথবা কাকাতুয়া পায়রার উপস্থিতি পাঠকের মনে কাব্যবোধ কি পরিমানে সঞ্জাত করে, একথা কবির ভাবনার বিষয় নয়। অর্থাৎ বিশেষ চেতনার 'পর নির্ভর করে তার কাব্যচিন্তা অগ্রসর হয়েছে। এই চেতনার সন্ধান পাঠককে নিজের গরজেই খুঁজে নিতে হবে। তবেই তিনি 'সহৃদয় সামাজিক'। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম্ ব্লেক এর দুটি পংক্তি স্মরণ করি :

The hills tell one another, and the listening
Valleys hear :

এবং পাহাড়ের কানাকানি কথা, আর উন্মুখ উপত্যকার ব্যাকুলতা—এর জন্ম পাঠককে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেখানে কবিতা এই প্রসাদগুণে অনন্য হয়ে ওঠে সেখানেই দায়িত্ব এসে পড়ে। শিল্পবিচার ও রসবোধ কোনটাই দায়িত্বহীনতা নয়, দায়িত্ববোধেরই স্বাক্ষর।

বাংলা কবিতায় যাঁরা ভারতচন্দ্র. এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের রচনানীতির ভক্ত, পরবর্তীকালে মাইকেলের দক্ষতা ও রবীন্দ্রনাথের কুশলতায় মুগ্ধ, ইদানীং সুধীন্দ্রনাথের যে নৈপুণ্য তাদের কাছে বিস্ময় উদ্রেক করে, জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবিতাবলীতে সে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অভাব রয়েছে একথা যদি কেউ বলেন তবে তা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হবে না। বহু কবিতার বহু পংক্তিতেই গদ্যভঙ্গীর রূঢ়তা আছে, একটা ঢিলেঢালা জড়তার ছাপ রয়েছে। মনে হয় যেন পংক্তিগুলি একটির পর একটি গড়িয়ে চলেছে। কোথায় তারা থামবে তা যেন কবির জানা নেই। কোন মহৎ কবির রচনায় এই যন্ত্রকুশলতার অভাব স্বভাবতই কাব্যমোদীকে পীড়া দেবে। এই সাধারণ অভিযোগ অনেককেই করতে শুনেছি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে কাব্যের রচনারীতি অথবা আঙ্গিক সম্পর্কে একটি প্রাথমিক কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, style is the man—একটু ঘুরিয়ে মানুষের পরিবর্তে কবি

কথাটি বসালে অর্থ ব্যাহত হয় না। এবং কবিকে স্রষ্টারূপেই জানতে হবে art of communication; সুতরাং প্রথমত কবির স্বভাবটি জানতে হবে —যে-স্বভাব অবশেষে কবিসত্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। ছন্দচাতুর্যে ভারতচন্দ্রের যে দক্ষতা, যমক শ্লেষ ও অনুপ্রাসের ঘটায় তার কবিতা যে ভাবে প্রাণবন্ত, আমাদের কালের এই 'নির্জনস্বভাব' কবির রচনায় তা একান্তভাবেই অনুপস্থিত। জীবনানন্দের স্বভাবে ঈশ্বর গুপ্তের চতুরালিরও কোন স্বাক্ষর নেই। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পর একালে আসা যাক। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যে ছন্দকুশলতা, প্রচলিত রীতিনিয়মের একনিষ্ঠ অনুধাবন, শব্দব্যবহারে যথাযথ প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি একটি ভাবধারা অবলম্বন করে চিন্তাপ্রযুক্ত যুক্তি আবেগ ও বক্তব্যের অনাড়ম্বর সরল অভিব্যক্তি দ্বারা নিশ্চিত লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা—জীবনানন্দ তার কবিতায় সাধারনত এপথও অনুসরণ করেন নি। তার প্রকৃতিতে বিশ্বপ্রকৃতির ও এই পৃথিবীর যে শব্দগন্ধবর্ণময় রূপ আছে, বিশেষ করেই বাংলা দেশের গাছপলা পশুপাখী নদীনালার যে নির্জন নিজস্ব জগৎ আছে তাদেরই সমানুভূতিতে তার প্রাণ কখনও অস্থির, কখনও ক্লান্ত, কখনও বিষন্ন বেদনামধুর। 'নির্জন' শব্দটি জীবনানন্দ সম্পর্কে বহুব্যবহৃত। আমার মনে হয়, পৃথিবীর মানুষের চোখে তিনি নির্জন স্বভাবের কবি, শুধুই ব্যবহারিক জগতের অর্থে তা প্রযোজ্য হয়েছিল, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে বিরাট বিশ্বচেতনার ভীড়, যদিও সেখানে কোলাহল নেই। এক সুগভীর সময়চেতনার অনন্ত বোধে তার মনের পরিধিতে যে বৃহৎ বিশ্বব্যপারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তা এক আশ্চর্য স্তব্ধতায় সমাহিতপ্রায়। নির্জনতা তার স্বভাব নয়, তার স্বভাব চেতনাময় উপলব্ধিতে একান্ত ভাবেই নিবিষ্টমনা; তাই তা গভীর, বিষন্ন, স্তব্ধ। শারীরিক স্নায়ুক্রিয়ায় তার চেতনা অস্থির। এই অস্থিরতা, বেদনাবোধজনিত ক্লান্তিই, হয়ত তার রচনারীতিকে মার্জিত কুশলী শিল্পীরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হতে দেয়নি। প্রবহমান সময়ের বৃত্তাকার গতির মতই যেন তা কেন্দ্রাভিমুখী, স্থিরদৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে যে নিশ্চিতি তা অর্থবহ, চিন্তা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি আরো এক গভীর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ। লাশকাটা ঘরের বিষাদময় পরিবেশে ঢিলেঢালা পয়ারই উপযুক্ত, এমন কি গদ্যছন্দও, চোদ্দ অথবা আঠারো মাত্রার শৃঙ্খলিত চাতুর্যে সেই অনু-ভাবনা ও তজ্জনিত অদ্ভুত পরিবেশ একান্তভাবেই নষ্ট হয়ে যেতো।

জীবনানন্দের শব্দ আপাত দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক ব্যবহার বলেই মনে হবে। গভীর অনুধাবনে জানা যাবে কোন শব্দটির পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। 'নিখিলের অন্ধকার', 'আঁকাবাঁকা আকাশের মতো', 'ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া', 'চিতার গন্ধ', 'আগুনের ঘিয়ের ঘ্রাণ'-এ কয়টি মাত্র উদাহরণ দেওয়া গেল। পরিবর্তন সম্ভব নয়, কারণ শুধুমাত্র চিন্তা ও যুক্তিই তার কবিতার আশ্রয় নয়, চিন্তাপ্রসূত চেতনা ও যুক্তি-আশ্রয়ী বোধি—যেখানেই নিজস্ব বিশিষ্ট এক ঐকান্তিক চেতনাসমৃদ্ধ হৃদয় উপস্থিত—তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে এবং ধ্বনি অর্থে বাচ্যার্থ অতিক্রম করে আরো গভীর, গূঢ় কোন অর্থ আরোপিত হয়েছে। এই গূঢ় অর্থ ইঙ্গিতময়—এবং অর্থেই কাব্যের শেষ নয়। যে অন্তর্নিহিত শক্তির ফলে এই ধ্বনি কাব্যশরীরে প্রবেশ করে তা ব্যঞ্জনা। ইংরাজীতে কোনটিরই প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ব্রাডলে অক্সফোর্ড বক্তৃতাবলীতে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে ধ্বনির পরিপূরক suggestion বলেই আমাদের মনে হতে পারে। জীবনানন্দের কবিতা, যদি বলা যায়, ধ্বনি-নির্ভর তাহলে তার কাব্যের একটি দিক আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই 'অন্য কোন অর্থে' পৌঁছুবার প্রয়াস তাঁর বহু কবিতায় রয়েছে। যেখানে নিশ্চয়তা থেকে অনিশ্চয়তায় যেতে চেয়েছেন, প্রেম থেকে অপ্রেমে, সেখানেও তাঁর লক্ষ্য লাশ-কাটা ঘরের মৃত মানুষটির শেষ ইচ্ছার মত। কোথাও যেন গভীর জিজ্ঞাসা, গভীর ক্ষত, গভীর ক্লান্তি! এই জিজ্ঞাসা থেকে কোন সুষ্ঠু অর্থে পৌঁছুবার প্রচেষ্টা শেষের কবিতাগুলিতে চোখে পড়ে এবং তারই জন্য জীবনানন্দকে প্রথমে চিত্র এবং পরে চিত্ররূপকল্পনা করতে হয়েছে। যাঁরা বলেন জীবনানন্দের কবিতায় চিত্র আছে, চিত্ররূপকল্পনা নেই তাদের রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে বলি। (বস্তুত image এর কোন যথাযোগ্য প্রতিশব্দ নেই।) চিত্ররূপকল্পনাই বোধ হয় ইমেজিষ্টদের প্রাথমিক দায়িত্ব। চিত্ররূপকল্পনা ছাড়িয়েও তার কবিতা যে কি আশ্চর্য ইঙ্গিতময়, গভীর অর্থবহ তার প্রমান প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই মিলবে। বস্তুত জীবনানন্দের রচনার পটুত্ব এখানেই, অন্য কোথাও নয়।

ষ্টিফেন স্পেণ্ডার কিছুদিন পূর্বে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, আজকের দিনে কবি সাহিত্যিকের কাজ হবে, লেখবার টেবিলের পেছনে তাক ভর্তি ক্লাসিক্যাল

সাহিত্য এবং জানালার ওপারে রাস্তার জনসাধারণ—এদের প্রতি যুগপৎ মনোনিবেশ করে কাব্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ রচনারীতি ও আঙ্গিক সম্পর্কে প্রাচীনদের কাছে হাতেখড়ি এবং বক্তব্যবস্তু সাম্প্রতিক জীবনের ঘটনাবলী থেকে আহরণ। কিন্তু কথাটির এখানেই শেষ নয়। এই সূত্র ধরে সময়-চেতনার গভীরে যাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। যদি কেউ ঘরে বসে কোন দৃশ্যপটের পরিবর্তন কল্পনা করতে থাকেন তবে নিশ্চই সরযূ নদীর তীরে উদ্গত-অশ্রু সীতাদেবী থেকে আজকের দিনে বনলতা সেন-এর অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারেন। এই কল্পনা সত্যাশ্রয়ী অথচ কালচেতনা ও একই সঙ্গে যুগচেতনার স্বাক্ষর বহন করে। এবং এই প্রসঙ্গে বিবর্তনের ধাপে ধাপে যেন অলিখিত, কখনো অনির্দিষ্ট কারণগুলি সম্পর্কে সচকিত ও সযত্ন থাকবেন তিনি সচেতন কবি, সন্দেহ নেই। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন বস্তুত সময়ের আবর্তিত রূপ, এখনে গতি বড় কথা নয়, গতির শেষে স্থিতির কল্পনাও তিনি করেছেন, যদিও

> অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
> মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;

কিন্তু তার প্রশ্ন তবু.

> কাল কিছু হয়েছিল ;—হবে কি শাশ্বতকাল পরে।

এখানেই জীবনানন্দের সময়-চেতনা ইতিহাস-চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ ইতিহাসের গতিমুখীনতা সম্পর্কে তার প্রশ্ন এসেছে, জিজ্ঞাসা এসেছে। মানুষের ভঙ্গুরতা ইতিহাসেরও বটে, তার অস্থিরতা কালস্রোতেরও বটে। এখানেই মনে হবে, তার ইতিহাস-চেতনা মানুষের চেতনাকে বাদ দিয়ে নয়। যাঁরা জীবনানন্দের কবিতায় মানুষী ধারণার সন্ধান পাননি, বলেছেন ইতিহাস থেকে মানুষের ভাবনা কল্পনাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তাঁরা তাঁর শেষের দিকের রচনাগুলি পড়লেই জানতে পারবেন, কালধর্মের যে বিরাট ব্যাপ্তি ও গভীরতা রয়েছে তার খণ্ডিত রূপই হচ্ছে মানুষের জীবন—(সে জীবন তাঁর ভাবকল্পনার জীবন যদিও) এবং মানুষের জীবনের যে ধারণা তা সম্পূর্ণই চেতনাপ্রসুত। জুহুর সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে সোমেন পালিত কল্পনা করেছে, তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা বেয়ে বেয়ে পৃথিবীর গতিপথ কি করে এগুচ্ছে। এই খণ্ডিত রূপ ক্রমশই বিরাট কাল ধর্মের দিকে কবির চেতনাকে অগ্রসর

করে নিয়ে গেছে। ম্যাক্সওয়েল সাহেব এলিয়ট প্রসঙ্গে যে ট্রাডিশনবোধের অবতারণা করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি।[২] 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটিতে জীবনানন্দ এই 'timelessness of tradition' এরই ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে হয়।[৩]

সাহিত্যে এরকম নজির আছে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা ব্যক্তিজীবনের কোন বিরাট গভীর দুঃখবেদনার কাহিনীকে রূপায়িত করবার জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকে কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা ভালো কবিতাও লিখেছেন এবং সাহিত্যের আসরে তাঁদের চিরকালের স্থান হয়ে আছে। ত্রিশের যুগে ইংলণ্ডের কবিকুল অথবা রেস্টোরেশন যুগের কবিদের কথা মনে হলে, এমন কি বৈষ্ণব কবিতার শেষ অঙ্কে এমন প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয় যে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রচার প্রসারের জন্যই কাব্যরচনা হয়েছে (অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা অবশ্য সার্থক সুন্দর কবিতা লিখেছেন)। এ প্রশ্নের অবতারণা এ জন্যই যে এমনি একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে যেমন কবিতার উদ্ভব হতে পারে তেমনি বলা যায়, অন্য এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁদের জীবনের প্রতিটি চিন্তাভাবনা একটি বৃহৎ কবিসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপেই যুক্ত হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি জীবনানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বিশুদ্ধ কবি, pure poet, যাঁর চিন্তায় ও কর্মে, কাব্যধারণায় ও ব্যক্তিগত জীবনের

২ For the Augustans tradition was unchangeable complete in all ways. For Eliot it is continually being added to……He will become aware of the presence of the past……he will have the true conception of the timelessness of tradition.

৩ অবশ্য জীবনানন্দ ও এলিয়টের কাব্যজীবনের বিবর্তন সম্পূর্ণই বিপরীত মার্গগামী। যেখানে এলিয়ট ক্রমশই 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' থেকে 'কোর কোয়ার্টেট' অভিমুখে যাবার সময় 'still point' এর সন্ধান করতে করতে এগিয়েছেন, অবশেষে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রতীতি খুঁজে পেয়েছেন, জীবনানন্দ 'অন্ধকার' থেকে চেতনায় ধাপে ধাপে এক আলোকের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন, যে-আলোক ধর্মীয় বিশ্বাস-প্রসূত নয়, নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে মানুষী চেতনা ও বোধির মাধ্যম থেকে যা লাভ করা সম্ভব বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এখানে কি বলা যায় না, বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্ন ও বহুধা বিভক্ত মূল্যবোধের মধ্যে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট মানবিক নতুন মূল্যবোধ আহরণে সচেষ্ট হচ্ছিলেন?

আচরণে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। একথা খুবই সত্যি তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন অথচ সর্বদাই কোথায় যেন একটা গভীর দূরত্ব নিয়ে বাস করতেন। সেই দূরত্ব কাটিয়ে আমরা ঠিক তাঁর মনের কাছে পৌঁছুতে পারি নি। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন এ তাঁরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন, তিনি সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকতেন। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, যত সহজই তা হোক, উত্তর দিতে তাঁর অনেক দেরী হোত। অনেক সময় এমন হয়েছে, কখন কি করতে হবে, বলতে হবে এ যেন তার জানা ছিল না। এত স্পর্শ-কাতর ছিলেন, যে-কোন আঘাতই তাকে অসম্ভব পীড়া দিত। যে কবি যে সমালোচকের নাম তিনি জীবনে শোনেননি তাদের সামান্য বিরূপ মন্তব্যেও ছেলেমানুষের মত ব্যথিত হতেন। আর তাঁর আরো একটি ধারণা দৃঢ়মূল ছিল, তাঁর কবিতা অনেকেই পড়েন না, পড়লেও দুর্বোধ্য বলে ছেড়ে দেন। একথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন না, তাঁর কবিতা পংক্তির পর পংক্তি মুখস্ত বলে যেতে পারেন এমন কবি ও পাঠকের সংখ্যা এই বাংলাদেশে কত অগণিত রয়েছেন। সারা জীবনব্যাপী অর্থকষ্ট পেয়েছেন, তবু জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করেন নি; শুনেছি, কোন একজন তথাকথিত সাহিত্যিকের চক্রান্তে কবিতা রচনার অপরাধেই তাঁকে অধ্যাপনা ছাড়তে হয়েছে, তবু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন নি। এমনি আরো অনেক কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়; তবু এটুকুই বোধ হয় বুঝতে যথেষ্ট হবে যে তাঁর সমগ্র জীবন যেন কবি হবার ঐকান্তিক সাধনাতেই পর্যবসিত হয়েছিল। তাঁর কাছে কবি অর্থ ছিল 'প্রাণময় বা মনোময় শরীরের ঊর্দ্ধে নিজ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত' থাকা। আজকের দিনে আমাদের কাছে, এই সমস্যাবিজড়িত পৃথিবীতে এ কথায় আস্থা রাখা, নিজেদের জীবনে এ মত আচরণ শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অবাস্তবও বটে। তবু তিনি প্রমাণ করে গেলেন, কান্তং কাব্যময়ং বপুঃ। এ কথা সাধারণের জানবার কথা নয়, তাই সকলের অগোচরে যে নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসাধনা তিনি দীর্ঘদিন ধরে করে গেলেন, আমাদের যুগে যার প্রমাণ আর সহজে মিলবে না হয়তো, তারই সাধ্যমত এইটুকু ইঙ্গিত দিলুম। আমাদের শিক্ষার রয়েছে তার কাছে একথা, যে হঠাৎ কোন উচ্ছ্বাসে, কোন বিশেষ ঘটনার ঝোঁকে পড়ে কবিতা রচনা করা হয়তো সম্ভব, 'কবি' হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী প্রস্তুতি দরকার, একনিষ্ঠ সাধকের মত কাব্যশরীর

গঠন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় শুদ্ধ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থেকে শেষ লক্ষ্য অভিমুখে দৃঢ় বিশ্বাসে অগ্রসর হওয়াই আমাদের অবশ্য কর্তব্য।*

* উপরের প্রবন্ধটি জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরে "উত্তরসূরী" পত্রিকায় জীবনানন্দ স্মৃতিসংখ্যার জন্য রচিত। সে কারণে এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থানে, বিশেষত শেষের দিকে, একটি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সুর ধ্বনিত হয়েছে। —লেখক

জীবনানন্দের কাব্যে প্রবহমানতা

বাংলা কবিতার ঋতুবদল বিস্ময়কর হ'লেও সে পরিবর্তনের ধাপে ধাপে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। কষ্ট হয় না কবিতার আবেদন গ্রহণ করতে। রবীন্দ্রনাথের পরে যারা উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখলেন, অথচ তার প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বকীয় স্বাক্ষর রাখলেন সার্থক কবি হিসেবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এবং যারা এই যুগেই রীতিমত সমসাময়িক ও উত্তরকালের একাধিক কবিদের ওপর প্রভাব ফেললেন তাদের সংখ্যা আরও সীমিত। জীবনানন্দ দাশ তাদেরই মধ্যে একজন, সম্ভবত, অগ্রগণ্য। বিগত পঁচিশ বৎসরেরও ওপর যিনি কবিতা লিখছেন তার কবিতায় ঢিলেঢালা ছন্দ, অযত্নকুশলতা, ভাষার শৈথিল্য রসিক পাঠককে পীড়া দেয়। অথচ যখন একাগ্রমনা হয়ে তার কবিতা পড়ে যেতে থাকি, তখন এ সমস্ত কথা তার কাব্যের পরিপূর্ণ আবেদনের পাশে অতি নগণ্যই মনে হয়। অন্য যে কোন কবির ক্ষেত্রেই হয়তো এই দোষ তার প্রধান ক্রটি বলে গণ্য হতে পারতো; যেমন—

> সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
> ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন;—কিন্তু এ ব্যর্থ ধারণা
> সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে……

অথবা,

'এক একটা দুপুরে এক একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়' ইত্যাদি অনেক স্থানেই এরকম কবিতা ক্রটি বলে মনে হবে। তবুও সমগ্র-ভাবে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়বার পর এই ধারণাই মনে থেকে যায়, যে এ-কবি এমন একটি অতি সাধারণ রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন, পেয়েছেন অতি সাধারণ অনাড়ম্বর দৃষ্টিকোণ, যাতে সবকিছুই কবিতা হয়ে রূপ পায়। অনেক স্থানেই তার কবিতা গদ্যপংক্তির মত মনে হবে, অথচ এমন একটা সুরের সূক্ষ্ম অনুভূতি, এমন সংগীতের অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা জড়িয়ে রয়েছে যে তাকে গদ্য বলে ভুল করা সম্ভব নয়।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

এই তিনটি মাত্র পংক্তিতে 'অনেক' শব্দটি ও 'ছিল' ক্রিয়াপদ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য যে কোন আধুনিক কবি এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হতেন, এরকম সহজ গদ্য লেখবার সাহস তাদের অনেকেরই হোত না। অথচ, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এ কবিতা হয়নি। এই আবেদন কেমন করে কোন্ রাস্তা দিয়ে কবি পাঠকের মনে সঞ্চাত করেন তা সমালোচনার তত্ত্বকথার পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু পাঠকসাধারণ এ কবির কবিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।/ বাস্তববাদী অথবা ভাববাদী, রোমান্টিক অথবা ক্লাসিক, জীবনানন্দ দাশ মূলত কোন্ জাতের কবি, এ তর্ক উপস্থাপিত করেও একথা স্বীকার করে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে কাব্যের রূপ যদি ছবি ও গানের যথার্থ সমন্বয় সাধনে প্রকাশ পায়, তবে তিনি কবি। 'বনলতা সেন' কবিতাটি যতবার পড়া যাক্ না কেন পুরোনো হয় না অথবা, মনে মনে পড়লে জোরে উচ্চারণ করে পড়তে ইচ্ছে হয়। এতে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে কবির একটি সহজাত সুরবোধ রয়েছে যা তার প্রয়োজনীয় অনুশীলনের অপেক্ষা রাখেনি। অথবা 'বহু অন্ধকার বিদর্ভ নগর' 'দারুচিনি-দ্বীপ' 'শিশিরের শব্দ' ইত্যাদির মধ্যে যে ছবি মনকে সহজেই আকর্ষণ করে তার রেশ কি সহজেই মুছে যায়? কিম্বা এমন কবিকর্মকুশলতার, নিখুঁত ছবি আঁকবার ক্ষমতার, কি অদ্ভুত স্পর্শকাতরতার উদাহরণ ধরা যায় :

এই বলে ম্রিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;

তাহলে অনুমান করা যেতে পারে জীবনানন্দ দাশের কবিতার পটভূমি শুধুমাত্র প্রকৃতির পরিবেশ নয়, অথবা মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের মত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নয়, বরং একটি অবিচ্ছিন্ন চেতনাবোধ তার কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমালোচকরা

অনেকে ইতিহাস-চেতনা বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন পৃথিবীর সঙ্গে একটা অতি গভীর সংযোগ, তখনকার মানুষের চিন্তা ভাবনার অংশীদার হয়ে সেইকালে ফিরে যাওয়া—এ কবিতার বিষয়বস্তু বলে অনেকে মনে করেন। সময়ের ধারণা করা একান্তই সম্ভব কিনা এবং বিশেষ কোন সময়ে বাস করে, ইতিহাসের কোন অধ্যায়ের ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে নিমগ্ন রেখে কালোত্তর সময় প্রবাহ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকা কতখানি আয়ত্তাধীন এ-প্রশ্ন জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে আসবেই।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময়।

অথবা

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা ;

ইত্যাদি পংক্তিতে পংক্তিতে এইরকম প্রতিফলন, একে নিশ্চয়ই কবির কোন নিশ্চিত ধারণা বলে মেনে নিতে হবে যা তার কবিচিত্তকে বহুদিন ধরেই এক অপরিমিত ভাববোধে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার আরো একটি লক্ষ্যণীয় দিক তার আশাবাদ। অনেকে মনে করেন, তার মতো কবির শুধু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই। প্রকৃতপক্ষে, তার কবিতার আশাবাদ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে নয়। সেই আশাবাদ মানুষের সর্বকালীন পটভূমিতে, সময়ের পরিমাপেই যার হিসেব করা যুক্তিসঙ্গত। কবি একটি ছোট কবিতাতে বলছেন যদি তিনি বনহংস হতেন আর তার সঙ্গিনী হতেন বনহংসী তবে 'আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকতো না'। এই খণ্ডিত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে যাবার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। অথবা কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা :

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনদিন আর।

এই ধরণের আশাবাদ একটু বিস্ময়কর যদিও, যদিও বিভ্রান্তিকর, তথাপি অস্বীকার করবার উপায় নেই, এ অনুভূতির গভীরতা কতখানি।

২

কোন কবির কাব্যবিচারে সাধারনত তার পরিণতির অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। সে পরিণতি কবিমানসের পরিণতি, রচনা রীতি ও আঙ্গিকের পরিণতি। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে 'পরিণতি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রবহমানতা' উপযুক্ত, কেননা তার কাব্যে সুসঙ্গত পরিণতি এসেছে ঠিকই, বিশেষ করে 'সাতটি তারার তিমির'-প্রকাশিত হবার পর থেকে মনে হয় যেন তার কবিতার এ এক নতুন অধ্যায়—নতুন অর্থবহতায় যার সমৃদ্ধি। তবুও এই শব্দটির বব্যাহারে আরো একটি গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার কবিতায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারা ছিল, যে ধারা বর্ষার নদীর মতই প্রবহমান, যে ধারার উৎস এবং সঙ্গম গভীর অর্থবহ. যে ধারায় এ বোধ জাগ্রত হয়, 'সব নদী ঘরে আসে' এবং যারা ফিরে আসবার পর 'থাকে শুধু অন্ধকার.' আর কিছুই নয়। এই প্রবহমানতা আবর্তিত, গতিপথ সরল অথচ বৃত্তাকার এবং সেই আবর্তিত রেখাতেই তার কবিতার অনুসরণ।

এবং যে দিন থেকে জীবনানন্দের কবিতা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত সেদিন থেকেই তার অনুভাবনা অন্ধকারকে কেন্দ্র করে:

> গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম
> আবার।

এই গভীর অন্ধকার থেকে কবি কেন জেগে উঠলেন তা তার কাছে এখনও পরিস্ফুট নয়, কিন্তু এই জাগরণ তাকে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে সে অভিজ্ঞতা তাঁর কাম্যও নয়। অন্ধকারের ঘুম ভেঙেছে নদী ছল ছল শব্দে। এই শব্দ প্রাণের আবাহন মাত্র। মাতৃগর্ভে যে অগম অন্ধকার, চেতনার প্রান্তলোকেও সেই একই অন্ধকার। জীবনানন্দের চেতনার জগৎ অনুভূতিময়; রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্বাদ, শারীরিক স্নায়ুক্রিয়ার পর নির্ভরশীল এই সব অনুভূতি—এরই সূত্র ধরে তার কবিতার শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত এক দীর্ঘ উত্তরণ। জীবনের পরিধিতে আলোকের বৃত্ত, পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রান্তর জুড়ে 'কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে' উৎসব শুরু হয়েছে। সেখানে মানুষিক সৈনিক হিসেবে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য সূর্য তাকে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ এই অভিজ্ঞতা তিনি চাননি। ফিরে যেতে চেয়েছেন আবার অন্ধকার মাতৃগর্ভে।

আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।

এই চূড়ান্ত নেতিবাদ আমাদের বিভ্রান্ত করে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যেখানে সমস্ত অনুভূতি চেতনা-প্রসূত সেখানে কবির বিরুদ্ধে নালিশ করাও অর্থহীন। অন্ধকারের তুহিনশীতল দেশ থেকে জেগে উঠে তিনি পৃথিবীর স্নেহ প্রীতি বন্ধন, উদ্যম চিন্তা কাজ, স্পন্দন সংঘর্ষ গতি দেখে ভয় পেয়েছেন। বার বার বলেছেন —'আমাকে জাগাতে চাও কেন'।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে
কোনোদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি কোনোদিন আর।

শুধু দুঃখ নয়, মনে হয় জগৎসংসারের পর জীবনজোড়া অভিমানও এই নেতিবাদের উৎস। এই কবিতাটির রচনাকাল সঠিক আমার জানা নেই। তবু দীর্ঘদিন পূর্ব্বে এমন মনে হয়। (অন্তত বাংলা ১৩৪৬ সনের পূর্বে একথা নিশ্চত বলা যায়)।

তারপর বহুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। অভিজ্ঞতার বহু স্তর পেরিয়ে এসে তিনি জেনেছেন :

'নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে সময়ের জালে আমি জড়িয়ে
পড়েছি ;'

মৃত্যুর পূর্বে রচিত এই কবিতাটি 'মহাজিজ্ঞাসা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ; প্রথম জীবনে যখন 'ব্যক্তি মানুষ' তার কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত ছিল, নিজস্ব ভাবনার চেতনার একটি সম্পূর্ণ জগৎ তিনি সৃষ্ট করেছিলেন—যে ইতিহাস-ধারণায় সামাজিক জীবের প্রায় বিলুপ্তি বলে আমাদের মনে হবে, জীবনের শেষ অঙ্কে ('সাতটি তারার তিমির'এ ও তার পরবর্তী কবিতাবলীতে) তার সেই ধারণা এক আবর্তিত গতিপথে পরিভ্রমণ করেছে যেন এবং এখানেও তার প্রাথমিক ধারণাই চিন্তাকে জাগ্রত করেছে :

মানুষের কত দেশ কাল
চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল

সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের আজ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে 'অন্ধকার' কবিতাটি থেকে কবি বহুদূরে সরে এসেছেন। অথচ এখানেও সেই 'অন্ধকারের' স্বপ্ন ও বিস্তার। প্রশ্ন যা মনে এসেছে তাও একই কেন্দ্রাভিমুখী। চেতনার গতিপথ সেজন্যই আবর্তিত বলে মনে হয়েছে।

প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা এই। আমারও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি? গভীর অন্ধকার থেকে ঘুম ভেঙে বহু বহু দিন সময়ের পারে পারে ঘুরে তিনি অন্ধকার থেকে বুঝি মুক্তি খুঁজেছিলেন। তাই সূর্যের সন্ধান তাঁর প্রয়োজন, আলোকের বলয় তাঁর কাছে ইদানীং সত্য উপলব্ধির মত। এবং এই আলোক আনন্দময় চেতনারই ভাস্বর চিত্ররূপ।

'একে বেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে—আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;'

'পরিণতি' না বলে 'প্রবহমানতা' ব্যবহার সম্ভবত এইজন্যই উপযুক্ত। সারা জীবনব্যাপী এই অভিজ্ঞতায় অন্ধকার ও আলোকের পাশাপাশি অবস্থানই তাঁর কবিতার উপজীব্য। চেতনার স্তরে স্তরে তিনি যেমন পথ খুঁজেছেন তেমনি অন্ধকার ও আলোকের ধারণা তাঁর মনে নানারূপ প্রতিফলন চিহ্নিত করেছে। অপ্রেম ও প্রেম, গ্লানি অন্ধকার ও আলোক বস্তুত একই সত্তার বিচিত্র রূপ।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যচেতনা

অমিয় চক্রবর্তী সম্ভবত অনিশ্চিত সংসারের বিরল বেলায় এক বিদেশী যাত্রী,

তিথি নক্ষত্রের হিসেব নেই, সন তারিখের খেয়াল নেই, চিরকালের পরিব্রাজকের উৎসুক চাউনি যার চোখে। দৃষ্টি তাঁর যদি বা কখনো কখনো দূর দিগন্তের ধূসর অতীতে পৌছোয়, কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকে না—আবার সামনে চলে, ক্ষেত খামার, বস্তী বন্দর, প্রশান্তি কোলাহল পেরিয়ে অন্য কোন অবশিষ্ট জনপদের দিকে। তাঁর মন বৈরাগী, 'ধূলোয়-মাখা ছদণ্ডের অতিথি', ক্লান্ত কান্নায় চোখে যাঁর জমাট-বাঁধা জল নেই, আছে ঔৎসুক্য ঔদাসীন্যের আশ্চর্য মিলন। তাঁর কবিতায় তাঁর অন্তরজীবনের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস যত না মেলে তার চেয়েও নরম অথচ স্পষ্ট গলায় শোনা যায় ইতস্তত চলা-ফেরা, নিত্যতা-অনিত্যতা, সম্ভব-অসম্ভাব্যতার অপরূপ করুণ কাহিনী—বিশেষত ক্লান্তিহীন পরিব্রাজকের একক প্রদক্ষিণের স্বাক্ষর তাঁর শেষ দু'টি কাব্যগ্রন্থে, শুধু ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যায়ের চিত্ররূপ নয়, ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার নিরিখও বটে। সমস্ত পৃথিবী তার সংসার, ছাড়ানো ছিটোনো, বিস্তীর্ণ পরিধিতে সীমায়িত যেখানে অভিজ্ঞতার প্রত্যন্ত ভূমিতে তিনি একক। নিছক খেয়ালখুশীর আনন্দে তার পথ-চলা নয়, জীবনের করুণ কঠিন আশ্চর্য সত্যটিকে চিনবার আগ্রহে মনের এই অস্থিরতা, যদিচ এ অস্থিরতার মৌল কারণটুকু জীবনের প্রতি বীতরাগ নয়, জীবনকে নিবিড় করে ভালোবাসবার একান্ত দায়। এখানে কোলাহল আছে, শান্তি আছে, আরাম বিলাসব্যসন অপর্যাপ্ত, সন্ন্যাসের তীব্র কঠোর আত্মপীড়ন অজানা নয়—তবুও সম্ভবত সর্বক্ষেত্রেই মোহান্ধ দুটি চোখ বিষয়নির্ভর, জটিল আবর্তে কুক্ষিগত; প্রসন্নতার সরল সুকুমার বোধ নেই, ব্যথা বেদনার আর্তিজনিত ব্যাকুলতা নেই, যন্ত্রণাজনিত মুক্তির উপাসনা নেই; দিকভ্রষ্ট যূথচারীর প্রত্যয়বিহীন অবিরাম পথচারণা—একালের এই অসুস্থতাই জীবনের মর্মমূলে আঘাত করেছে—এবম্প্রকার সন্দেহ, দ্বিধা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার বিষয়ীভূত প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। এবং তথ্যের ভারে তাঁর কবিতা ভারাক্রান্ত নয়, যদিও তাঁর সজাগ সন্ধানী দৃষ্টি জীবনের নানা দৃশ্যপটে ছবির পর ছবি সংগ্রহ করেছে। 'ধূলোয়-মাখা ছদণ্ডের অতিথি' ঘরে

ফিরে লিখি দাসখৎ, আমি প্রবাসী, হারানো দুপুরের কাঙালি'—এহেন কবির আক্ষেপ কিনা জানিনা এমন স্বগতোক্তি, তবু ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী যদি কাউকে রাখতে হয়, চলতে হয় অনিশ্চিত নিশানায় তবে তিনি এই 'বস্টনে বাঙালি দূরবাসী' কবি যিনি 'পালা-বদলের বেলা'য় 'ঘরে-ফেরা বাঁশি' শুনে মুহূর্তে কাতর হন। এ কাতরতা যদি তাঁর বেদনাবিক্ষত মনের সুকুমার বিকাশ না হোত, এ আক্ষেপ যদি না তাকে নব নব সৃষ্টির দ্বারে পৌঁছে দিত তাহলে এমন কথা বলা সম্ভব হোত কি করে ?

মনে হয় ফিরে পাওয়া মৃন্ময়ী বাসায়
গোলক চাপার তলে ব'সে আছি,
খোয়াই-পেরোনো স্থির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি
শান্তিনিকেতনে,
অথচ সবই সে কোন পূর্বজীবনের সন্ধিমাখা,
বিদেশের ক্ষণোজ্জ্বল সায়াহ্নে এখানে শুধু বাঁশি।

(পালা-বদল। ১১)

শুধুমাত্র, কাব্যের ভাষায় যাকে নস্ট্যালজিয়া বলে, তাই যদি হোত তাহলে এ কাব্যের প্রসারতা হোত না, এই সঙ্গে আরো একটি আপাত দার্শনিক মন উঁকিঝুঁকি মারছে—সেটি তার বৈরাগী মন—ডিট্যাচমেণ্ট যার খাঁটি ইংরেজী কথা। যেন অন্য কোন গ্রহলোক থেকে তিনি দৈবাৎ এ সংসারে এসে পড়েছেন—দুচোখ ভরে দেখেছেন, মন পূর্ণ করে রস সঞ্চয় করছেন, 'ধান ভরা প্রাণ ভরা মাটির আসন আনন্দের গান ভরা'—এ পৃথিবীকে চিনেছেন, যেভাবে 'নোটবুক থেকে' 'কত রঙা কত ছবি—হয় এক ছবি' —তার কবিতাও যেন বহু বৎসরে বহু অভিজ্ঞতায় একটি পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেমন হয়েছে তার জীবন, 'দীর্ঘতর জীবন দাঁড়িয়েছে চিত্রবৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ বহুঝুরি বট॥' ক্রবাদুরদের মত তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, কোন পেছুটান নেই, বন্ধন নেই, মোহ নেই, আসক্তি নেই অথচ [illegible] ভালোবাসা আছে। তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাপ্রদীপ, মাটীর ঘরের শান্ত ছায়া [illegible] বাংলার গ্রামে গ্রামে অজস্র বৈচিত্র্য—ছোট ছোট সংসারের মাধুর্য, [illegible]

আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বৌ। (পারাপার। ২৫)

তাঁর চোখ এড়ায়নি। অথচ মুহূর্তেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, ডুসেলডর্ফে'র বোমা-বিধ্বস্ত সহরের 'শূন্য পাশে গলির জগতে চূর্ণ চূর্ণ বেলা'য় 'ম্লান হাসিমুখ মেয়ে জানলার কাঁচে একান্তে উৎসুক চুল আঁচড়ায় যত্ন করে'। এবং এই বিষয়-বিতৃষ্ণ বৈরাগীর দৃষ্টি তাঁর না থাকলে এমন স্বচ্ছ সহজ উপলব্ধি হয়তো আসতো না।

প্রাণ পুনর্বার চলে অগণ্য মৃত্যুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

(পারাপার। ৮৫)

তাঁর কবিতার বহুস্থানে ধুলো, ধুলিমুঠি. ছাই, কাঁচ, ছায়া ইত্যাদি শব্দের প্রায়শ ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। যা উড়ে যাবে, এক জায়গায় পড়ে থাকবে না, যা ভেঙ্গে যাবে, চিরকালের আয়ু নেই যার এমনি সব প্রতীক তিনি অনায়াসেই বিভিন্ন কবিতায় ইতস্তত প্রয়োগ করেছেন। 'এক মুঠো ছাই এর পশরা' 'ধুলো থেকে তুলে নাও' 'ফেলো ছায়া ফেলো রঙ কবিতার কাঁচে', 'ধুলোর স্বর্গের দাম পূর্ণ শোধ হবে' ইত্যাদি পংক্তি বই দুটির দিকে দিকে ছড়ানো। যা আছে, যা কিছু দেখছি, যতটুকু পেয়েছি তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। চিরকালের জন্য নয়, ক্ষণিকের জন্য আতিথ্যেই তার পরম পরিতৃপ্তি।

কিন্তু এখানেই একথার শেষ নয়। চিরদিনকার পৃথিবীতে তিনি চিরকালের যাত্রী নন। উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো পঞ্চাশ সালের যে জীবন, সমসাময়িক কালের স্বাক্ষর যেখানে সমাজে, সংসারে, দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায় নানাভাবে মিশে রয়েছে, তিনি সেই সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিজেকে খুজতে চেয়েছেন। মিশিয়ে দিয়েছেন এই ভীড়ে, কলকাতার ধুলো ধোঁয়া-মাখা গলির অস্পষ্ট অন্ধকারে, জোনাকি-আলোয় স্বল্প আলোকিত ঝিঁঝি-ডাকা গ্রামের তুলসীমঞ্চে অথবা চার্লস নদীর ধারে 'মধ্যাহ্নে বার্নিশ করা আকাশের গায়'। স্ট্রীম লাইনরে চলতে চলতে 'টেক্সাসে আমার জানলা মাটি-রৌদ্র মাখা' এ-ও যেমন সহজেই তাঁর অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির মধ্যেই, তেমনি ওহায়োতে 'মায়ামি সুন্দরী নদী'র 'দুচোখের ভাবা' তাঁর অজানা নয়। 'রাত্রির প্লেন' অথবা 'ডুসেলডর্ফ' কবিতাতে এ স্বাক্ষর রয়েছে। ট্রেন, ট্রাক, ট্যাক্সি, এ্যারোপ্লেন ইত্যাদি অতি-আধুনিক যানবাহনের পুনঃপুনঃ উক্তিতে মনে হয়, বিশ শতকের মধ্যযুগে সমস্ত পৃথিবী যে-গতির নেশায় উন্মত্ত সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। অথবা এমন পংক্তি কয়টিতে সমসাময়িক

জীবনের ছন্দটি যেভাবে ধরা পড়ে তাতে প্রতীতি হয় এ-কালকে তিনি নিপুণভাবে চিনেছেন :

তীরে-তীরে
নিয়ন্ আলোর শঙ্কা।
ট্যাক্সি শব্দ পৌঁছে শান্ত হয়,
অন্ধকারে
তীব্রজ্বলা লাল রাস্তা, প্রগল্ভ বিদ্যুৎঝড়া ছোটে
ব্রড্ওয়ের ন্যুইয়র্ক, নিশাচর,··· (পালা-বদল। ২৩)

তাঁর কাব্যের পরিধি দেশকালের গণ্ডি মানেনি, স্বীকার করেনি মানুষে মানুষে দেশে দেশে ব্যবধান। সব মানুষের আনন্দ বেদনা, সকল মানুষের চিন্তা ভাবনা, সংসারের ছোট ছোট দুঃখ দৈন্য একটি বৃহৎ 'চৈতন্যময় মনে'র উজ্জ্বল আলোকে এক হয়ে মিশে গেছে। এজন্যই তাঁর কাব্যে একটি সহজ অনাড়ম্বর প্রতীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সুনিবিড় আত্মীয়তার পরম ঐকান্তিক অনুভূতির চিহ্ন প্রতি কবিতাতেই বর্তমান। 'পালা-বদল' কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাস' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়। পরিবেশ যদিও দূরদেশের, আবহ স্বতন্ত্র তবু্ও অ্যানার দিদিমা যেন আমাদেরই ঠাকুমা-দিদিমা হবে, তার ভাই কাজ করে, খবর এনেছে, প্রকাণ্ড বাঁধ হবে সিসি-আইসিস দুটো নদী বেঁধে। নতুন শহর গাঁথা হবে, আর

এই গ্রাম
তাহ'লে
উঠে যাবে॥ (পালা-বদল। ৫৫)

এই যে ঘর হারাবার বেদনা, একি বহু দুরান্তের অন্য কোন মানুষেরও বেদনা নয়? 'তাহ'লে' শব্দটি একটি পৃথক পংক্তিতে রেখে অনুভবের সমস্ত গুরুত্বটুকু বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে সম্ভবত।

এই দেখাশোনা, সারা পৃথিবীকে নিজের আপন দেশ করে নেওয়া, পরিব্রাজকের মতো সমাজে সমাজে সংসারে সংসারে দুদণ্ডের অতিথি হয়ে থাকা— এরই প্রকাশ হোল তার অপূর্ব চিত্রধর্মিতায়। বস্তুত, কোন বাঙালী পাঠক তাঁর কাব্যে প্রথমেই আকৃষ্ট হবেন এই অতি-নিপুণ দক্ষতার জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র দক্ষতাই এখানে শেষ কথা নয়। স্বচ্ছ, মোহমুক্ত দৃষ্টি—সহানুভূতি ও

মানবিক প্রেমে যে দৃষ্টি পরিপুক্ত ও সর্বদেশীয় মননশীলতা যে-মেজাজের সমধর্মী, তাঁর চিত্রময় কাব্যকুশলতাকে নূতন স্বাদ এনে দিয়েছে। কত সহজ, অনায়াস, কত ঘনিষ্ঠ তিনি হ'তে পারেন, আপন-পর ভেদাভেদ কি নিমেষেই না ভুলে যেতে পারেন তা তাঁর চিত্রকুশলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে বোঝা যাবে না। "পারাপার" কাব্যগ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠাই এ-প্রসঙ্গে পংক্তির পর পংক্তি তুলে সাজাতে ইচ্ছে করে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়েই ইচ্ছে সংবরণ করা যাক্—("পারাপার" ও "পালা-বদল" থেকে):

১। কচি রোদ্দুরের বুকে
ষ্ট্রবেরির ঝোপে লাল মিষ্টি ফল দোলে ; (পারাপার। ২৭)

২। নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোপাটি ছোলাক্ষেত, শর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো লতানো চাল—
বাঙলা—
ছোট ছোট আকাশ ভর্তি। (পারাপার। ৮)

৩। থার্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া
ধানের মরাই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
(পারাপার। ৬০)

৪। আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক। (পারাপার। ১১৩)

৫। ব'সে থাকি ভাঙ্গা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে
গঙ্গার ওপারে, দেখি, কিছু না, মাছটা, পাখিটা,
কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভীড় করে,
হাঁ করে তখুনি মানে জাহ্নবিত্বে, ভেঁপু কেনে। (পালা-বদল। ১৯)

৬। নামে
অন্যদিন, ক্যান্‌সাসের গ্রামে
রাশি রাশি, স্নো-এর অজস্র পাপ্‌ড়ি নিঃশব্দ বিলাসী
শুভ্র সূচির শিল্প। (পালা-বদল। ৪৭)

৭। শর্ষে তিসির খেতে ঢেলেছে সবুজ মজ্জা রস,
সংযুক্ত বাসনা পুষ্পে, মেঘে কালো, শ্রাবনের বুকে
দূরের ঘনানো কান্না, (পালা-বদল। ৭৩)

উপরের চিত্রগুলি পরপর লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে নিছক বর্ণনার প্রাধান্য ছাড়াও অন্য আর একটি ইঙ্গিত রয়েছে। "পালা-বদল" গ্রন্থের 'অ্যান্ আর্বার' কবিতাটিতে একটি পংক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

এই তো চোখের মগ্ন ছবির অগাধ থেকে ওঠা

এখানে 'মগ্ন' ও 'অগাধ' শব্দ দুটি লক্ষ্যণীয়। সমস্ত চিত্রধর্মিতার এইটিই সম্ভবত মূল কথা। নিছক বর্ণনাই চিত্র নয়, নিছক দৃশ্যপটকে ধরে রাখাই কুশলতা নয়—যে-যে বিশেষ ছবি কবির চোখকে 'মগ্ন' করে রাখতে পারে—এবং তারও পরে তাঁর সকল চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে 'অগাধ' থেকে আবার রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে, তাই চিত্র। উপরোক্ত চিত্রগুলি এর পরে সম্ভবত বিশেষ একটি অর্থবহতায় প্রতীয়মান হবে।

চিত্র সম্বন্ধে আরো একটি বক্তব্য আছে। এই দ্বিতীয় বক্তব্যটিই বেশী উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। প্রত্যেকটি চিত্রই কবিতাটিকে ক্রমশ এগিয়ে দেয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবরূপের মধ্যে এমন একটি ব্যঞ্জনা থাকে যা পাঠককে কবির সহমর্মিতার নিকটও আপন করে তোলে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সবচেয়ে প্রসাদগুণ এই যে তিনি পাঠককে সহজেই নিজের অন্তরঙ্গ করে নিতে জানেন—তাঁর কাব্যের দুরূহতা নিয়ে যাঁরা তর্ক উপস্থিত করেন সম্ভবত তাঁরা ভুলে যান যে কবিতার পাঠক, এ যুগে, পরিশীলিত রুচি, নিষ্ঠা ও সাহিত্য সাধনার অধিকারী হবেন, এ সামান্য দাবীটুকু কবিরা পাঠকদের কাছে আশা করেই কাব্যচর্চা করেন। ধরা যাক্ প্রথম (১) চিত্রটি। এটি যে শুধু অনুপম একটি বিদেশী চিত্র তা নয়, একটি প্রাণবন্ত জীবনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, রদ্দুরের 'বুক' এবং তারও নতুন কৈশোর ('কচি' অর্থে)—ষ্ট্রবেরীর ফল তাইতে দুলচে—এ চিত্রটি বিশেষ করে শুধু যে প্রেরণার আভাষ দিচ্ছে তা নয়—সমগ্রভাবে একটি গতিশীলতা, স্পন্দমানতার পরিচয় বহন করছে। এ ভাবে পর পর চিত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিভিন্ন চিত্রগুলিতে এমনতর অনুপম গুণাবলী উপস্থিত। বিচিত্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও ছিমছাম অনাড়ম্বর রূপকল্পনায় তাঁর চিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাহুল্যবর্জিত অথচ স্পষ্ট

নিখুঁত চিত্রময়তাই এই কাব্যের অন্যতম প্রসাদগুণ। 'মাছটা, পাখিটা—এই শব্দ দুটির ব্যবহারে 'টা' অক্ষর যুক্ত করায় যে সহজ ঐকান্তিকতা ও নৈকট্যবোধ, 'কানাই ঘোরায় লাঠি'—চিত্রটিতে বাংলার কিশোরদের জীবনের দৈনন্দিন অতি পরিচিত ঘটনাটি, নানারকম খুঁটিনাটি চিত্র ধরে রাখবার কুশলতায় অথবা 'দূরের ঘনানো কান্না'—এমন একটি ঘনসন্নিবিষ্ট আবেগময়তা—এ প্রকারের কত না বৈচিত্র্য তার চিত্রগুলিতে—একটি সজাগ চোখের, স্পর্শকাতর মনের, কুশলী লিপিকারের, দক্ষ শিল্পীর কারুকার্য কবিতাগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়ানো।

অমিয় চক্রবর্তীর শিল্পচেতনা কি রকম? তার কি কোন নির্দেশ আছে তাঁর কবিতায়? সম্ভবত আছে। নীচের পংক্তিটি দেখা যাক।

তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো, (পারাপার। ১৮)

অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির স্বীকৃতি আছে (বুক) ঔজ্জ্বল্য আছে, রং আছে (রোদ্দুর) আর রয়েছে দৃষ্টির সূক্ষ্মতা (সুতো) এবং এ সকলই একটি সুন্দর বিনুনিতে গাঁথতে হবে (তাঁতে বসানো)—কবিতার এমন একটি পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা যদি আরোপ করা যায়, শিল্পের একটা নির্দিষ্ট নিরিখ তাহলে সম্ভবত স্থিরকৃত হতে পারে তাঁর কবিতায়। 'কত আলো, কত রঙ, কত কল্পনায়, মায়াময়' তাঁর কবিতার শরীর—আর কাব্যশরীরের সঙ্গে কাব্যের আত্মার যদি মিলন দেখতে চাই তবে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে 'চৈতন্যময় মন'কে তিনি কেমন করে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'একাকীর মহিমায় অনাত্মীয় বিপুল মধুর' কে তিনি কি করে অসীম ঔৎসুক্যে বুকে করে নিয়ে ধন্য হতে চেয়েছেন! শিল্প অর্থ স্বচ্ছতা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মনের স্বচ্ছতা, সহজ করে আনা, চিন্তা ভাবনার সরলীকরণ আর চেতনার প্রশ্ন মনের বোঝা-পড়ার প্রশ্ন, মনকে কাজে লাগানোর প্রশ্ন, নানা বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একই কেন্দ্রে স্থাপন করা—না হলে এই প্রত্যয়বোধ কি করে সম্ভব, নিরাভরণ কাব্যশরীরে এমন চেতনার উপস্থিতি কেমন করে গ্রহণীয়?

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাঁটি। (পারাপার। ১৩)

অনেকটা ইনটুয়্যইটিভ্ মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিল্পচেতনা অনেকাংশেই ইনটুয়্যইটিভ্ মার্গে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর কুশলতার উদ্ভব এবং সেকারণেই এ সকল চিত্রে অনাড়ম্বর সহজ নিপুণতা।

'পালা-বদল' বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে "চিরন্তন বাংলা দেশকে"—এ নিছক চিরাচরিত অর্থে দেশপ্রেম নয়। যেমন করে মা ভালোবাসে শিশুকে, এ তেমনি ভালোবাসা—যেমন করে আমি বাংলা দেশকে চিনেছি, দেখেছি, মনে মনে গড়ে তুলেছি—এর অশিক্ষা কুসংস্কার দারিদ্রকে স্বীকার করে নিয়ে মনে মনে গ্রহণ করেছি তেমনি—'ঘরে ফেরা বাঁশি'র ডাক তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন। 'বাঁশী' শব্দটি বহুবার বহু কবিতাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেহেতু বাঁশী শব্দটি প্রতীকী, এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না, অন্য কোন গূঢ় ও ব্যাপক অর্থ এতে আরোপিত হয়েছে। বাংলা দেশের ঘর সংসারের কথা এতই উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্কিত, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর যন্ত্রণাময় দিনযাপনের পরেও এ দেশের প্রশান্তি ও সমাহিতির কথা যে গভীর শ্রদ্ধায় বর্ণিত তাতে আশ্চর্য হতে হয়; 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থে 'সন্দীপ' কবিতাটি পড়বার পর আবার যদি 'পালা-বদল' এর অন্তর্গত 'মিল' কবিতাটি পড়া যায় তাহলে তাঁর এই করুণ ব্যথিত ভালোবাসার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। শুধু বহুদূরে থাকবার জন্যই নয়, ঘরে ফেরবার যে অহরহ অভিলাষ তা সম্ভবত একটি আদিম যোগসূত্র থেকে—মনে হয়, এ দেশকে ভালোবাসার মূলে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যও রয়েছে, যিনি নূতন করে এ দেশকে আমাদের চিনিয়েছেন।

এবং সর্বশেষে এই উক্তিই অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে, তার ঐতিহ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে, তার আশ্রয়ছায়ায় নিজের কাব্যসুষমা সমৃদ্ধ করেও তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন; অযথা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়নি। তিরিশের যুগে যখন অনেক কবিরই মনে হয়েছিল (বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখ কবিদের কথাই ধরা যেতে পারে) বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তি ব্যতীত বাংলা কবিতার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই, অমিয় চক্রবর্তী তখন থেকেই অতি নিশ্চিত শান্ত অথচ দৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে একটি আশ্চর্য সংগতির দিকে এগুচ্ছিলেন এবং আজকে অন্তত একথা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না, রবীন্দ্রকাব্যধারার সার্থক উত্তরাধিকার যদি কেউ দাবী করতে পারেন তো, সুধীন্দ্রনাথ ব্যতীত, একমাত্র তিনি।

বিদ্রোহ করেননি তিনি, কেননা তিনিই লিখতে পেরেছিলেন :

এই যারে জানি সে তো হাওয়া নয়,
মর্মরে অরণ্যে যার উতলা গভীর পরিচয়।
... ...
এই যে সহজ আজ একান্ত আপন
বনস্পতি পূর্ণতায় হয়েছে মগন।
... ...
মধ্যাহ্নের রিক্তপটে রৌদ্র লেগে
ঐ দেখ বনস্পতি আছে জেগে।
ধ্যানের মতন
বিশুদ্ধ তাকেই দেখ, মন। (পারাপার। ১০৮)

শুধু চৈতন্যের দীপ্তিতে নয়, প্রাণনের গভীরতায়, মাটীর রসে নিজের মনকে অভিষিক্ত করে নেওয়ার যে শিক্ষা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছেন তার আশ্চর্য স্বাক্ষর আরো বহু কবিতাতেই পাওয়া যাবে—

দয়া মায়া মৃত্যু প্রেম
মাটিতে ফোটাও—
সে মাটি এই তো দেহ, (পারাপার। ১০৯)

অথচ তিনি বিশিষ্ট—এতই বিশিষ্ট কবি (যে-বিশিষ্টতা রবীন্দ্রোত্তর যুগে মাত্র আর একজন কবি অর্জন করেছিলেন, মহৎ কাব্যকুশলতার পরিচয় রেখেই—তিনি জীবনানন্দ দাশ) যে অন্য কোন কবির সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা না করেও তাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরা যায়, স্পষ্ট করে চেনা যায়। সম্ভবত এই কারণেই, তিনি যে ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তা বাংলা কাব্য-ধারার জারক রসেই সমৃদ্ধ—বিদেশ থেকে নানা পণ্য এনে তাঁর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হয়নি (যদিচ একথা স্মরণীয়, তার মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতি ইদানীং অন্য কোন বাঙালী কবির নেই)। এমন আশ্চর্য সুন্দর উজ্জ্বল পংক্তি, এমন বর্ণ, এমন স্বচ্ছতা কি সচরাচর বাংলা কাব্যের প্রায়-দার্শনিক গুরুগম্ভীর অথবা অতি-মধুর কান্তকোমল পদাবলীর বিস্তীর্ণ ভূমিতে চোখে পড়ে?

কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক। (পারাপার। ১১৩)

আধুনিক বাংলা কবিতা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেকে বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা আর যেন দানা বাঁধেনি, কিন্তু সহৃদয় কাব্যরসিক এমন কথা হয়ত স্বীকার করবেন না। বস্তুত আধুনিক বাংলা কবিতায় জীবনের নানা অঙ্কের প্রতিচ্ছবি, নানা পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কৃত নতুন মনোবিন্যাস, রচনাশৈলীর সুনিপুন কারুকর্ম। এ যেন সমতলের গঙ্গা নয়, বরং কৈলাসবাহিনী—যেখানে নানা দিকে এঁকে বেঁকে নানাভাবে, উৎস মুখ থেকে বার হয়ে দূর পথের সন্ধানে সে সদাজাগ্রত।

বাংলা কবিতার এ বিভিন্নমুখী মানসের ইতিহাস খোঁজ করতে গেলে অনেক তথ্যের সন্ধানে ছুটতে হবে। একথা অজ্ঞাত নয় যে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে নিগুঢ় সম্বন্ধের তত্ত্ব এ যুগে মিলেছে, যা সত্যিই যুগান্তকারী, প্রাত্যহিক জীবনের সংগে যার গভীর সহযোগ। এ সকল প্রভাবগুলো কারু পক্ষে এড়ান সম্ভব ছিলো না। যাঁরা অবশ্যি তাৎক্ষনিক প্রেরণা লাভের আশায় ছুটলেন, তাদের দুর্ভাগ্য অপরিসীম, স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু যাঁরা সেই নবলব্ধ জ্ঞানকে সহায় করে জীবনদর্শনের খোঁজ করলেন, তাকে নতুন করে রূপায়িত করার চেষ্টা করলেন তারা ক্রমশ সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছেন।

আধুনিক কবিতার পুরোভাগে যাঁরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাদের অন্যতম। তাঁর প্রথম আবির্ভাবের কথা বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকেই জানতে পারি, জানতে পারি সে আবির্ভাব কি আশ্চর্য বিস্ময়কর! 'কল্লোল'এ প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রর "কবি-নাস্তিক" কবিতার কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব বসু বলছেন: 'মুগ্ধ হয়ে গেলাম! রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও বাঙলাদেশে আরো একজন কবি আছে, এই আবিষ্কারে সমস্ত অন্তরাত্মা আলোড়িত হয়ে উঠলো। এই কবির ভাব, ভাষা, সুর rhythm সব রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র থেকে একেবারে আলাদা। অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব। রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্রের ধরণ ছাড়াও বাঙলা ভাষায় কবিতা লেখা হতে পারে। স্বপ্ন-লোকের অস্পষ্টতা ছেড়ে এই প্রাণ উচ্ছ্বসিত, সতেজ পেগানিজ্‌ম্—অমাদের নব যৌবনের রক্ত তার প্রভাবে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। মধুক্ষরা ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই সাহসিক বন্ধুরতা, ভাবার এই স্পষ্ট ঋজুতা—মনে হলো হঠাৎ অবগুণ্ঠন সরে গিয়ে বাঙলা কবিতার নতুন

একটি রূপ প্রকাশ পেল। আনন্দে, বিস্ময়ে সেই রূপকে অভিনন্দিত করলাম।' ভূমিকা হিসেবে বোধ হয় এটুকুই যথেষ্ট—যথেষ্ট এই জন্তেই যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার পাঠককে বুঝতে এমনিতেই দেরী হয় না যে এ কবি স্বয়ং সম্পূর্ণ, এর নিজস্ব একটা জাত আছে, রয়েছে অপূর্ব প্রাণশক্তি যা প্রতিনিয়ত তার কাব্যকে ভাবে, রূপে, রসে মণ্ডিত করেছে। সমগ্রভাবে বাঙলা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যদিও শিবনারায়ণ রায়ের উক্তি বিনা প্রতিবাদেই গ্রহণযোগ্য, "The thirties gave us the poetry of barrenness, but it was not barren in poetry" তবুও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সম্পর্কে বোধহয় একথা প্রযোজ্য নয়। তার কবিতায় যে উজ্জ্বল প্রাণ প্রাচুর্য, অফুরন্ত আবেগ অথচ সেই সঙ্গে গভীর কাব্যবোধ ও সর্বোপরি জীবনানুভূতি তা তার কাব্যকে আশ্চর্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। নজরুলের পরেও যে কোন কবি এমনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশময় হতে পারেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে জীবনের অনুভূতিকে নিংড়ে নিয়ে কাব্যলোক সৃষ্টি করতে পারেন তা ভাবতেও একদা বিস্ময় লাগত।

জীবনের নগ্নরূপের একটি সুন্দর মাধুর্য আছে; এ একমাত্র সেই বিশুদ্ধ কবিমানসের অন্তর্লোকেরই সুস্থ সবল প্রকাশ যা সে সময় একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেই সম্ভব ছিল। বুদ্ধদেব বসু দুঃখ প্রকাশ করেছেন, "কবি নাস্তিক" ও "ওরা ভয় পায়" এ কবিতা দুটি "প্রথমা"য় স্থান পায়নি বলে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার উৎসমূল খুঁজতে গেলে সত্যিই এরা অপরিহার্য। তার কবিতায় দিনের আলোয় রূপে রসে গন্ধে ভরপুর, যেখানে নিত্যকালের আনন্দলোকের প্রতিচ্ছবি, যেখানে শুধু অফুরন্ত জয়গান তা কি আশ্চর্য হয়েই না ফুটে উঠেছে! সেখানে দৃষ্টির বিভ্রম তার হয়নি, সহজ আবেদনে অন্তর্লীন বেদনাতেও তা রৌদ্রের মত উজ্জ্বল। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন "যে রহস্যে, যে সৌন্দর্য্যে, যে গূঢ় প্রেরণায় কবিতার সৃষ্টি—এখানে তাই পাওয়া যাচ্ছে; অতি সহজ, সাধারণ কয়েকটি কথায়, অতি সহজ এই অনুভূতির নিবিড়, আন্তরিক প্রকাশে।"

কবিতায় অনুভূতির ক্ষেত্রে অফুরন্ত হলেও তা পরিমিত প্রকাশের অপেক্ষা রাখে; রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন :

রূপ-নারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম;

জানিলাম, এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

তখন এ অনুভূতি যেন এক আশ্চর্য আবিষ্কার! তার দীর্ঘ বৎসরের প্রলম্বিত কাব্যসাধনার ভাষা অতি সহজেই ভাবকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ দিক থেকে ভাগ্যবান কবি। তার লেখনী সংযত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। আবেগের বাহুল্য থাকলেও ভাষার জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই—ভাবে ভাষার দ্বন্দ্ব বিলুপ্তপ্রায়, বরং যে পূর্ণ সুসামঞ্জস্য রয়েছে তা কাব্য-রসিককে মুগ্ধ করে। কবিতার প্রতি কবির এই সত্যাশ্রয়ীতা, সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্তার এই মমত্ববোধই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাকে সার্থক করেছে। 'প্রথমা'তে যে পরিমান আবেগ ও উচ্ছ্বাস রয়েছে, 'সম্রাট' এ তা অনেক সংযত হয়েছে, "ফেরারী ফৌজ"এ ভাষা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তার কবিতার আঙ্গিকের এ পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে—গতিবেগ ও চঞ্চলতা শেষের দিকে এসে অনেক সমাহিত হয়েছে, ব্যাপ্তি ও সংবেদনশীল হয়েছে, এক কথায় যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে এসেছে। সার্থক শিল্পীর সবচেয়ে বড় গুণ বোধ হয় ভাব ও ভাষার দিক থেকে এই পরিণতি লাভ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় এই পূর্ণতা তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'প্রথমা' কাব্যের বিষয়বস্তুতে জীবনের দুটি বিভিন্নমুখী দিকের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমগ্রভাবে মানুষের জীবনে যে ব্যাপকতা ও গভীরতা বিশ্ব-লোকের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্ক, একদিকে যেমন তার কাব্যে এক বৃহৎ সত্যানুসন্ধানের অঙ্গীকার, তেমনি পীড়িত জনগনের কথা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধারণ জীবনের ছোট খাট তুচ্ছ ঘটনা এবং পরিশেষে প্রেমের সহজ সুন্দর স্বীকৃতি ও পরিণতিতে এক পরিতৃপ্ত কাব্যলোকের সৃষ্টি হয়েছে যা সহজ প্রকাশে ও আন্তরিক আবেদনে উজ্জ্বল।

মানুষের কথা বলতে গিয়ে তার আদিম পাপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়েছেন, মানুষের দেবতা পথভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, রাস্তা তার দুস্তর এমন বোধ জন্মেছে তার কবিতায়, তথাপি বৃহৎ মানবাত্মার মধ্যে নিজেকে তিনি মিশিয়ে দিয়ে এক প্রকাণ্ড সত্যের অনুসন্ধানে বহু কবিতা উৎসর্গ করেছেন।

একদা ওয়াল্ট হুইটম্যান যে বলেছিলেন: আসল কথা হলো, মানুষ

মানুষকে চিনবে, ভাই ভাইকে—প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সম্পর্কে একথাটি খুবই সত্য। তিনি এক জায়গায় বলেছেন :

যত মানুষের জন্ম হয়েছে তারা যে আমার ভাই
নারী যে আমার ভগ্নী ও প্রিয়তমা—

(অনুবাদ)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার সঙ্গে তাই এক এক জায়গায় হুইট্‌ম্যানের এই আশ্চর্য মিল! শুধু তাই নয়, মেরেডিথের 'Earth philosophy' এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে।

যে দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান্টিক কবিরা প্রেমকে দেখেছেন, নানাভাবে প্রেমের ব্যাখ্যা করেছেন, নানা অনুভূতির চিত্র এঁকেছেন, সে-প্রেম প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় অনুপস্থিত। প্রেমের বিচিত্র গতি, তার বিশিষ্ট অনুভাবনা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেও অস্পষ্ট। তাঁর কাছে কবিতার উৎসমূল হোল বেদনায়, 'শুধু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি',—কিন্তু তার পরিণতি মহান। কিন্তু এ প্রেমের মাধুর্য ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অথবা এ নয় পারস্পরিক স্বীকৃতি নির্ভর। এ বিশেষ ভালোবাসায় কোন পাত্রী বিচার নেই, হয়ত সে কারণে ভাববাদী আদর্শনিষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করলেও মানুষী প্রেমের আনন্দ বা বেদনা, অস্থিরতা বা টানাপোড়েন-এর চিত্র একেবারেই মেলেনা। আমার ত মনে হয়েছে, কবিতায় প্রেমের রহস্যময় বিচিত্রতার অনুপস্থিতি হালের পাঠকদের কাছে ভয়াবহ ত্রুটি বলেই মনে হবে। বৃহত্তর মানবপ্রেমে উত্তীর্ণ হওয়া হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার প্রস্তুতির পথ স্বতন্ত্র, সে অভিজ্ঞতার নিরিখ কবির অজ্ঞাত।

২

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কবিতার বই 'সম্রাট' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে, অর্থাৎ যখন বাংলা কাব্যে বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী ও সমর সেন আবির্ভূত হয়েছেন। বিষ্ণু দে-র দুর্বোধ্যতা ও কবিমানসের তির্যক অভিক্ষেপ প্রেমেন্দ্র মিত্রে অনুপস্থিত, অমিয় চক্রবর্তীর ইমপ্রেসনিজম্ কচিৎ পাওয়া যায়, সমর সেনের উগ্র আধুনিক হবার প্রয়াসও সেখানে মেলেনা; যদিও বাংলা কবিতার মোড়

যোয়ালেন অনেকটা এঁরাই। 'প্রথমা'র কিছু রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত এবং কিছু প্রভাব-মুক্ত সচেতনতা সমর সেনের অবচেতন মানসের অনাড়ম্বর স্বীকৃতির কাছে ম্লান হলো—কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে সমস্যা রইলো না। কি ভাবে লিখবো এটাই হল বড় কথা, কি লিখবো তা গৌণ। "ফুল নিয়েই যে কবিতা লিখতে হবে এমন কি কথা, রোলস রয়েস্ নিয়ে কেনই বা লেখা যাবে না" কোন ইংরেজ সমালোচক বললেন। কেউ বা ব্যাঙ নিয়ে কবিতা লিখলেন এবং বললেন সূর্য বা ওক গাছের সাবলিমিটির চেয়ে তা এক তিল কম নয়।

বলা বাহুল্য যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্র এ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মত চলার চেষ্টা করেছেন, তিনি তাতে পুরোপুরি সক্ষম হননি। এদেশে যুদ্ধের ঢেউ তখনো লাগেনি, সমাজের নানা স্তরে তার সংঘাত টের পাওয়া যায় নি। কিন্তু যুদ্ধ-পূর্ব কবিমানস এক নতুন সচেতনতা লাভ করছিল; প্রমাণস্বরূপ, 'সম্রাট' এর প্রথম কবিতা ধরা যাক্ :

> 'জানি,—'পামের' চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য,
> কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবেনা।
> কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
> স্তব্ধ হয়ে;
> একদিন তার স্থানুত্ব যাবে ঘুচে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এর পূর্বে 'মানুষের' কথা বলেছেন, 'জনতা'র কথা বলেননি। 'কাঠের টুল' ইতিপূর্বে তার কবিতায় স্থান পায়নি। অর্থাৎ দৃষ্টিকোনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দচয়নেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আধুনিক কবিতার রিয়ালিজম্ হোল তার স্পষ্টবাদিতায়। যা দেখেছি যা জেনেছি তার নৈর্ব্যক্তিক স্বীকৃতিতে; সেখানে সত্যের সহজ আলোয় নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে হয়ত।

এ যুগের নানা সংঘাতে নানা দ্বন্দ্বে, নতুন পৃথিবীর নতুন পরিবেশে, মানব মনের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে মনে প্রশ্ন এসেছে, সংশয় জেগেছে। অনেক দ্বিধার সংগে তিনি প্রশ্ন করেছেন, আজকের জীবনে আগেকার সেই বসন্ত কি জাগবেনা আর। জীবন থেকে সমস্ত রং বুঝি মুছে গিয়ে শুষ্ক কঠিন একটা আবরণ পড়ে থাকবে; নাগরিক সভ্যতায় আমরা প্রতিমুহূর্তে নিজেদের সত্তাকে বিনষ্ট করছি, বাইরের বৃহৎ জীবনে যে বিস্ময় আমরা তাতে উদ্বুদ্ধ হইনি।

বন্দী বাঘের চোখে কবি মুহূর্তের জন্য অরণ্যের স্বাদ পেয়েছিলেন, টেরাই এর জংগলের ছবি ফুটে উঠেছিলো তার চোখে। নগ্ন জীবনের প্রকাশ দেখে তিনি লরেন্সের মতই আনন্দে শিউরে উঠেছিলেন। বর্তমান সভ্যতার ভারকেন্দ্র নগরগুলির মায়াবী পরিবেশ থেকে সামান্যতম ক্ষণটুকুর জন্যও হয়ত আর এক নগ্ন পরিবেশে যাওয়া যায়, সৃষ্টি করা যায় মৃত্যুর নতুন রূপ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে এহেন নস্‌টালজিয়া বোধের স্বরূপ লরেন্সরই মত, উত্তরতিরিশ কোন ইংরেজ কবির মত নয়। ভিক্টোরীয় যুগের সভ্যতা শালীনতা ও রুচি পরিবেশনের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে লরেন্স ও তার সহকর্মীদের বিদ্রোহ; ছাপোশা বাঙালী জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র তেমনি এক বোহেমিয়ান আদর্শবোধে নিজের চিন্তা অনুষঙ্গকে মেলাতে চেয়েছেন।

আত্মসচেতন কবি নয়, আত্মভোলা কবি হয়েই তিনি তৃপ্ত থাকতে চান। ব্যক্তি, সমাজ, জনতা ইত্যাদি ব্যবহৃত শব্দগুলির কোন বিশেষ তাৎপর্য তার কাব্যে রয়েছে বলে মনে হয়না, বরং মানবতা অথবা মানব-ইতিহাস সম্পর্কেই তার ঔৎসুক্য প্রখর। 'ফেরারী ফৌজ' নামক তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে চিন্তার অস্থিরতা কচিত মেলে। যদি নস্‌টালজিয়ার বিস্মিত রূপেই কাব্যের প্রসাদগুণ ধরা পড়ত তাহলে আক্ষেপের কিছু থাকতনা। কিন্তু তার এবম্বিধ বর্ণনায় পারম্পর্য থাকলেও অনুভূতির গাঢ়তার অভাবে তা ম্লান হয়ে ফিকে হয়ে আসে, মনে যথেষ্ট দাগ কাটেনা।

অবশ্য এমন কবিতাও পূর্বে তিনি লিখেছেন যেখানে এক নিমগ্ন তন্ময়তা আছে, ধ্বনির মাদকতা আছে :

হে-ইডি, হাইডি, হাই !
অরণ্য ডাকে ওই, যাই !

এই উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল জীবনে যেখানে সভ্যতার কৃত্রিম মুখোশ নেই, যেখানে মৃত্যুর ভয়কে উত্তীর্ণ করে বৃহত্তর জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ মেলে সেখানেই জীবনের শেষ আবিষ্কার বলে মৃত্যুকে তিনি চেনেন আর চেনেন শিব নীলকণ্ঠকে।

তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
—ছিলো এই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে

নিছক ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার এই কবিতার বইটিতে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চান—আরো কোন এক গভীর অর্থবহতায় যার সার্থকতা।

কোন এক নিস্তব্ধ দুপুরে কাক-ডাকার শব্দ শুনে হয়তবা তার মনের আশ্চর্য কবাট খুলে যায় যখন সকাল বিকালের দৈনন্দিন চিত্রটুকুই তিনি ধরে রাখতে পারেন :

আবার বিকেল হবে
রোদ যাবে পড়ে
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।

শান্ত সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে কাক ডাকার তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেসুরো শোনালেও অস্বীকার করেননি তিনি :

সব ঝড় পার হয়ে আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্ম্মল।

এই কবিতাটি যে বিস্ময়বোধের অবতারণা তা কতটা De la Mare কে স্মরণ করায়।

তার কবিতার পরিবেশ কাব্যপাঠের উপযুক্ত আবহ সৃষ্টি করে। এমনতর আবহ 'প্রথমা'য় পেয়েছি, 'সম্রাট' এ আরও পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু "ফেরারী ফৌজ" এ তিনি আবহাওয়ার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। 'প্রেতায়িত' কবিতাটিতেও এর আশ্চর্য্য 'bizarre' অনুভূতি পাই—এখানে কোন গল্পের কাঠামো নেই—কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় জীবনের স্বাদ মেলে।

সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে
ঝাঁকড়া অশত্থ গাছে একটি কি দুটি পাতা পড়ে,
দুএকটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে ঘুরে খসে পড়া শুকনো পাতায়।

কিন্তু তাই সব নয়। এ আবহাওয়ায় তিনি নিজেকে অবশেষে হারিয়ে ফেলেন :—

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল, কোথা দেশ, দিক !

৩

প্রতিভার স্বাক্ষর তার প্রকাশে, নচেৎ প্রতিভার পৃথক কোন মূল্য নেই। এবং এ-প্রতিভা যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে সুন্দর ও সার্থক সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয় তেমনি কালেদিনে তা যে অবক্ষয়ের দিকেও যেতে পারে, এমত ধারণা অসঙ্গত নয়।

সেক্‌স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্র কেউই এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম নন। তথাপি তার জীবদ্দশায় আমরা তার সৃষ্টিকর্মে আশা রাখি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বিগত কয়েক বৎসর ধরে ইতস্তত কবিতা লিখলেও তার কাব্যের প্রসাদগুণ যে অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে এমন ধারণা করা অন্যায় নয়। তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা' পড়লে একনিষ্ঠ কাব্যপাঠকের এমন ধারণা হতে পারে। কবিতা কি, রসাস্বাদন কোন্ রাস্তায় হতে পারে ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলে তার হালের কবিতাগুলি কতটা টিঁকে থাকবে বলা মুস্কিল। বস্তুত যে ভাবাবেগ একজনকে যৌবন বা প্রাক্-প্রৌঢ়ত্বেও হয়ত বা মানায়, প্রৌঢ়ত্বে এসে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখলে মন সেখানে আপোষ মানতে চায় না। বিশেষত সমস্ত প্রাণধর্মী সাহিত্যেই অন্তত মানসিকতার পরিণতির ইঙ্গিত না পেলে তার অভিজ্ঞতার গাঢ়তায় সন্দেহ জাগে। যুগধর্মের দাবী মিটিয়েই কালধর্মের কষ্টিপাথর উত্তীর্ণ হতে হয়, একথা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অজানা নয়, তথাপি সাম্প্রতিক কবিতাগুলিতে সে-চিহ্ন নেই দেখে আশংকা ঘটা কি অস্বাভাবিক ? অথবা 'প্রথমা' এবং 'সম্রাট' এর কবি আরও গভীরতায় অভিজ্ঞতার ঘনিষ্টতম বোধে নিজেকে ক্রমশ উন্মুক্ত করবেন এমন দাবীও কি আমাদের অসঙ্গত ?

বিষ্ণু দে-র কাছে ক্লাসিসিজম্ তার কাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র, অন্তরঙ্গ নয়—প্রাচীন ঐতিহ্যে বার বার তার ফিরে যাওয়ায় রোমান্টিক নস্‌টালজিয়ারই সাক্ষাৎ মেলে। অথচ সুধীন্দ্রনাথ প্রকৃত অর্থে ক্লাসিসিষ্ট; কাব্যকলা ও জীবনচর্যার যুগ্ম দায়িত্ব, সাধ ও সাধনার একান্ত অন্বয় তার কাব্যে প্রতিফলিত। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ছবি ও গান, পরস্পর মিলিত ঐক্যতানে সুরের অন্বয়, সুধীন্দ্রনাথে জগৎসংসারের নানাবিধ অভিজ্ঞতার সমীকরণ. ফলত নির্বিশেষ স্বকীয় চিন্তার প্রতিবিম্বিত কাব্যরূপ। একথা নয় যে বিষ্ণু দে চিন্তা-ভাবনায় পরাঙ্মুখ অথবা সুধীন্দ্রনাথে লিরিক কাব্যকুশলতার প্রাণময়ী আবেদনের অস্বীকৃতি, তথাপি উৎসুক পাঠকের চোখ এড়ায় না যে বিষ্ণু দে-র চিন্তাভাবনা সাময়িক বিলাসমাত্র, বুদ্ধিবাদী নৈয়ায়িকের স্থৈর্য ও তন্ময়তা সেখানে অনুপস্থিত এবং অন্যত্র, সুধীন্দ্রনাথ লিরিক কাব্যে আস্থা রাখলেও, তার ভালবাসা প্রকৃতিকেন্দ্রিক নয় (এ আলোচনায় স্বীকৃত রয়েছে যে রোমান্টিক কবিতার নানাবিধ প্রকাশের মধ্যে লিরিকধর্মিতাও অন্যতম এবং বিশিষ্ট)।

জীবন অর্থে. রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় গা ভাসান, ক্লাসিসিষ্ট এর কাছে পূর্বচিন্তা অনুযায়ী অভিজ্ঞতার একীকরণে প্রয়াস : বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উপরি-উক্ত মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। যে অর্থে অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অথবা সুকান্ত ভট্টাচার্য বামপন্থী, সে অর্থে বিষ্ণু দে বামপন্থী নন। তার কবিতার বামপন্থী অথবা মার্কসীয় ধারার উপলক্ষ্য ব্যক্তিগত বোধ ও বিশ্বাসে ততটা নয় যতটা যুগচিন্তার অস্পষ্ট প্রভাব ও ইসারায়। এমনকি অ-পরিণত কিশোর কবি সুকান্তও যখন স্পষ্ট. উজ্জ্বল ও সতর্ক, বিষ্ণু দে তার এবম্বিধ চিন্তাধারায় সংকুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত। বস্তুত চিন্তা-ভাবনার সচেষ্ট প্রয়াস তার কবিকুশলতাকে মুক্তি দেয়নি, বরং বিশুদ্ধ আবেগ—যা তার কাব্যের প্রাণশক্তি—তাকে নানাস্থানে প্রতিহত করেছে। সেকারণে বিষ্ণু দে-র কবিতার সমগ্র বুদ্ধিবাদী আবেদন আমাদের কাছে বর্তমান যুগের ক্ষুরধারবুদ্ধি ইনটেলেক্‌চুয়ালের পোজ্ মাত্রই হয়ে থাকল,

ঘনিষ্ঠ প্রতীতিতে রূপ পেল না। অতএব সুধীন্দ্রনাথ জীবনকে কল্পনার আশ্রয়ভূমি মাত্র মনে করেন নি। কল্পনা যখন চিন্তার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে তখন সে অভিজ্ঞতাকে সহায় করে, নচেৎ কল্পনা শুধু বিলাস মাত্র। জীবন অর্থে যেমন কল্পনা, তেমনি অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তারও দ্যোতক। এই দুয়ের যুগ্ম উপস্থিতিই একমাত্র কবিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, স্বকীয় চরিত্রে উজ্জলতর করতে সক্ষম হয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সেই বিশিষ্টতার উদাহরণ।

প্রেম, প্রকৃতি যেমন একদা কবিতার উৎসস্বরূপ বিবেচিত ছিল, ইদানিং মানুষের ভাব-অনুষংগ আরও গভীর অর্থবহতায় তাকে নিমগ্ন রেখেছে। অভিজ্ঞতার পরিধি তার সীমিত নয়, বিচরণের ক্ষেত্র তার ব্যাপক, অবিমিশ্র দুঃখসুখের স্বাদও বিলুপ্তপ্রায়। উনিশ শতকের উদার ঐতিহ্যে যে নিয়মতন্ত্র ও একই সময় নৈতিক স্থিরচিত্ততা ছিল, দুই মহাযুদ্ধ, বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা ও পারিবারিক সংহতির অন্তর্ধান-এর ফলস্বরূপ তার অধোগতি হয়েছে। অনিবার্য উদাহরণ তার মানুষের বর্তমান অস্তিত্বে, যন্ত্রণার সঙ্গে বিধৃত করেছে তার অপমৃত্যুর কথা। এ হেন সময় বিষ্ণু দে এক দিকে ঐতিহ্য আশ্রয় করলেন, অন্যদিকে মার্কসীয় চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে জনসাধারণের কথা কবিতার অঙ্গীভূত করলেন। সুধীন্দ্রনাথ মুখ্যত মননের শিল্পী বলেই এ শতকের অভিজ্ঞতাকে চিন্তার সংহতিতে একাগ্র করেছেন। জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনা তাঁর কবিতায় ব্যক্তি, সমাজ কি রাষ্ট্র, ধনতন্ত্র বা গণতন্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাবলীতে নতুন রূপে দেখা দিল। তিনি যে বিংশ শতকের বিভ্রান্ত পৃথিবীতে একজন, এ জগৎসংসারে তাকে যে অনিবার্যরূপেই প্রত্যেকের গ্লানিমুক্তির পথ খুঁজতে হবে এ সত্য তার কাব্যে প্রতিভাত। এবং সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের যা কিছু রিয়ালিজম্ এখানেই বর্তমান, এই একান্ত ঘনিষ্ঠ স্বীকৃতিতে, বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত দ্বিধামুক্ত কণ্ঠের নির্লিপ্ত উৎসাহে। সেকারণে তার কবিতার পাঠক, প্রথমে বাক্‌বিন্যাসে সামান্য হোচট্ খেলেও, সমাপ্তিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এই বলে, যে কাব্যপাঠ বিফল হ'ল না, বিষয় এবং বিষয়ীর অভেদে, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অদ্বৈত মূল্যায়নে লাভবান হওয়া গেল।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রকৃতি-প্রেম সুধীন্দ্রনাথে বিরল, যদিচ প্রথমোক্ত কবির মুখ্য আশ্রয় শুধুমাত্র প্রকৃতি নয়, এমন কি সম্ভবত শুধুমাত্র প্রেমও নয়;

কোন কিছুকে অশেষ করে ধরে রাখবার ধৈর্য তার কাব্যে অনুপস্থিত। কারণ-স্বরূপ হয়ত বলা চলে, বিষ্ণু দে-র কলাবৈকল্যে এক আপাত বিরোধ লক্ষ্যণীয়, সে বিরোধের মূল তার এই দ্বৈত সত্তার অনুসন্ধানে। যেখানে তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সেখানে তিনি শব্দে, চিত্রে এক অপরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন—এবং এ প্রক্রিয়ার পেছনে সচেষ্ট প্রয়াস নেই—বিষ্ণু-দে-র কাব্যকলার সাথকতা এখানেই। হয়ত প্রকৃতি, হয়ত বা প্রেম, কখনো কলকাতার বিচিত্র জীবন-ধারার টুকরো ছবি, বিদেশী সাহিত্যের ছিটেফোঁটা, এদেশ ওদেশের ক্লাসিক চরিত্রের উদ্ধৃতি—এই সব কিছু মিলে যে সিম্ফনি সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোত যদি তিনি এই আশ্চর্য সুরের জটাজাল সৃষ্টিতে অসমর্থ হতেন। তার কবিতার প্রকৃতি, ব্যাপক অর্থে, সুরের এই অনুসন্ধানে নিহিত—অজান্তে যেমন কোলরিজ্ কুব্লা খানের স্বপ্ন দেখেছেন, নিজেও সঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি কেমন করে অপরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, বিষ্ণু দে-ও তেমনি এক আশ্চর্য অনুভূতিময় লালিত্যে কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেখানে তিনি এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তার কবিতাও নিতান্তই অর্থহীন, অসার হয়ে গেছে। অন্যত্র সুধীন্দ্রনাথ এই রোমান্টিকতার বিপরীতগামী পথে নিজের অস্তিত্ব খুঁজেছেন, (একথা অবশ্যই স্বীকার্য, রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবিতার মূলত যে ফারাক তা জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পার্থক্য হেতু। অন্য প্রভেদগুলো গৌণ, কেননা, তা শুধু মাত্রারই প্রভেদ, চারিত্রিক নয়)। 'ক্রন্দসী' বা 'অর্কেষ্ট্রা'র পৃষ্ঠা জুড়ে এমনতর ক্ষোভের সন্ধান মেলে। তার ব্যক্তিগত আর্তনাদ একদা 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থে মানবের ভাগ্যকেই কেন্দ্র করে অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করেছে। তিনি নিজেকে নায়কের ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ভেবেই যে এমন একটি নায়ক বর্তমান বিশ্বনীক্ষায় নিজেকে অপাংক্তেয় রাখেনি, তারই মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করেছে এ শতাব্দীর অসহায়তা। সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের যে পরিস্থিতে তিনি নিজেকে স্থাপনা করেছেন তার কেন্দ্রে প্রকৃতি নয়, প্রেমও নয়, বরং বৃহৎ জীবন চেতনার সাড়া, ফলত তার কবিতার আবেদন অনেক গভীর ও ব্যাপক। সুধীন্দ্রনাথের মন যে ক্লাসিক-ধর্মী সেকথার সমর্থনে উপরোক্ত আলোচনা সাধারণের স্বীকৃতি লাভ করবে, আশা করা যায়; এবং এ প্রসঙ্গে আরও তন্নিষ্ঠ সমালোচক বলতে পারেন হয়ত যে তিনি কোথাও বিষয় ও বিষয়ীর ভেদে সীমারেখা টানেন নি। তাঁর

মানসিকতা টানাপোড়েনের ফলেও স্থির, সংযত; বাক্যবিন্যাস চিন্তাধর্মের অনুকূল, এমন কি প্রতিকূলতাতেও স্বধর্মে আস্থাবান। বিষ্ণু দে, অন্যপক্ষে, অস্থির; বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তার গতিবিধি কিছুটা কৈশোরিক চপলবৃত্তির লক্ষণাক্রান্ত।

২

'উর্বশী ও আর্টেমিস' বিষ্ণু দে-র প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যেখানে প্রেম কবিতার উপজীব্য। সে সময় কবি তরুণ, আজ থেকে আরো সাতাশ আটাশ বৎসর আগেকার রচনা। 'প্রত্যক্ষ' অথবা 'উর্বশী'র মত কবিতা সেকালে লেখবার অবকাশ প্রত্যেক কবিরই থাকে, যদিচ বিষ্ণু দে-র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তখনো কিছু মেলেনি। যৌবনের যা কিছু দোষ অথবা গুণ তা কবির রচনাতে বর্তায়। তবু 'এপ্রিল' কবিতাটিতে প্রথমেই যে ধ্বনির স্পর্শ লাগে তা পরবর্তীকালে তার কবিতাকে অনুরঞ্জিত করেছে, অথবা 'সন্ধ্যা'র দুএকটি লাইন—যা চোখকে আটকায়, মনকে নিবদ্ধ রাখে। যদিও যৌবন থেকে যৌবনোত্তর কালে উপনীত হতে গিয়ে প্রেমকে তিনি তত উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দাঁড় করাননি তবু একথা বলা অসমীচিন হবে,

> শুধু লিলি তোমার শরীর
> মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল।

প্রভৃতি পংক্তিতে তিনি প্রথমেই প্রেমের শীতল স্পর্শ অনুভব করেছেন; বরং তৎকালে রমণীর প্রেম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর যে ধারণা ছিল, তিনিও সম্ভবত সে ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেছেন; 'কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌' নামক অংশ-কবিতাটিতে বুদ্ধদেবের নিশ্চিত প্রভাব রয়েছে মনে করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'ই বিষ্ণু দে-কে বাংলা দেশের অন্যতম প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এবং তার পর তিনি যদিও দীর্ঘকাল কবিতা লেখার অভ্যেস ছাড়েন নি তথাপি সে সুরটিকে আর তিনি অমন অন্তরঙ্গ করে এযাবৎকাল পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি; অথবা পারেননি নতুন সুরে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে;—কিছু ভালো কবিতা অবশ্য 'পূর্বলেখ' এবং পরবর্তী কবিতাগ্রন্থগুলিতে ইতস্তত রয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় চিন্তা বা

বক্তব্য নিতান্তই গৌণ, এবং নানাভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করবার চেষ্টায় বহু পংক্তি তিনি ব্যয় করলেও কাব্যপাঠক তার সে কৌশলে মুগ্ধ নয়। তিনি পরবর্তী সময়ে নিজেকে ক্রমশই যে প্রকৃতির পরিবেশে জড়াতে চেয়েছেন তাতে সে আবেগ আর পূর্বেকার মত ফুটে ওঠেনি এবং যদিচ, বুদ্ধদেব বসুর মত তার কাব্যে আবেগের তীব্রতা নেই, তবু আবেগের যে জৈব প্রেরণা ও স্বাভাবিকত্বর ফলে তার কবিতা একদা আমাদের মনোহরণ করেছে—তা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছে বললে অসত্যভাষণ হবে না।

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া

অথবা

শরীরে তোমার অলকনন্দা গান

অথবা

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বল বইবে কে ?

এরূপ স্বাভাবিক, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল পংক্তি পরবর্তীকালে তার কবিতা থেকে খুব বেশী উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় দুই যুগ পূর্বে বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে যে সব উৎসাহবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা, 'মোহপ্রবণ' (সমালোচকের সবিনয় স্বীকৃতি) হলেও, সত্য এবং কাব্যের বিচারে তিনি মালার্মের বক্তব্যকে নিশ্চিত নজির স্বরূপ উপস্থিত করে দেখাবার যে প্রয়াস করেছেন 'কাব্যের উপাদান ভাবনা নয়, ভাষা' তাতে বিষ্ণু দে-র কবিকৃতির অকুণ্ঠ সমর্থন মেলে। তবু কথা থেকে যায়। কেননা, এ ভাষা নিছক ভাষা মাত্র হলে অনেক ছড়া-লেখক বা ভাষাতাত্ত্বিক বড় কবি হতে পারতেন। এই ভাষায় যিনি রচনা করেন তার মন বলে একটা পদার্থ রয়েছে এবং সে মন কাব্যগুণসমন্বিত শুধু নয়, বিশিষ্ট এবং অনন্ত। অন্যত্র বিষ্ণু দে-র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বন্ধুবৎসল সুধীন্দ্রনাথ যে বলেছেন তার 'মনীষা প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগফল' তাতে বহু বিতর্কের অবকাশ থাকে, বিশেষত যখন সৃষ্টিকার্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন কতদূর সক্রিয় তা বিবেচ্য। দেশজ ঐতিহ্যকে আত্মগত করবার জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সজাগ সতর্কতাই সম্ভবত বেশী কার্যকরী এবং কে না জানে দেখার এবং

অনুভবের যে বিস্ময় তা পাণ্ডিত্য দ্বারা পূরণ হবার নয়, যেখানে এই বিস্ময়বোধই কবিতার অথবা যে কোন শিল্পকর্মের নান্দীমুখ। এবিষয়ে দ্বিমত হবার আশংকা বহু স্থানে থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের মতামত সাধারণভাবে স্বীকার্য, 'চোরাবালি'র যে সমস্ত কবিতায় 'তিনি সত্যসত্যই সফল, সেখানে তাঁর চর্যা ও চর্চা একাগ্র, বোধি ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন। তখন তার পাণ্ডিত্যকে আর অবান্তর লাগে না, দর্শন বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদিতে সুদ্ধ উপমার উপলক্ষণ জাগে; এবং অনন্তর অনভিজ্ঞের জ্ঞান-চক্ষু খুলুক বা না খুলুক, প্রজ্ঞাপারমিত অনুষঙ্গের আহ্বানে অন্তত অনু-কম্পায়ীরা নিঃকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়। এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা'। এ প্রসঙ্গে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে, তবে আধুনিক কবিতার উৎসাহী পাঠকের কাছে বাহুল্য-বোধে তা বর্জিত হ'ল। এই কবিতাটি অথবা 'ওফেলিয়া'—এদের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই—এবং কেন যে কবিতা দুটির উৎকর্ষ তা চুলচেরা বোঝাতে গেলে নন্দনতত্ত্বেরও ব্যাখ্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে, যেখানে আমাকে নিরুপায় হয়েই আবার অন্যের টীকা অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে।

প্রথমে উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র কাব্যের এবম্বিধ বিচারের যে কোন আপাতবিরোধ নেই তা বলাই বাহুল্য, কেননা তিনি যে চিত্ররূপকে সঙ্গীতের ধ্বনি ও অন্তর্নিহিত লয়ের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন তাতেই তার ব্যবহৃত ভাষা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে—এবং এ ভাষাতেই চিরকালের কবিতা লেখা হয়েছে। বস্তুত যে কোন শব্দই প্রকাশময়, অর্থবহতা দ্বারা ভাবকে সমৃদ্ধ করতে পারে—কবির কাজ, তাদের যথার্থ অন্বয়-সাধনে। কখন কেমন করে এ সম্ভব হবে তা সঠিক নির্ণয় করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, এর পেছনে অদৃশ্য যদিচ, একটি বিরাট বিজ্ঞানী প্রক্রিয়া কাজ করতে থাকে, যেখানে বহু বিভিন্ন উপাদান একই সঙ্গে নিরন্তর এসে মিলিত হয়। আবার এও লক্ষ্যণীয় যে সব কিছুর সাহচর্যে পরিপূর্ণ শিল্পরূপ গড়ে উঠলেও অনেক সময় তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। পরবর্তীকালে যখন বিষ্ণু দে তার 'পাণ্ডিত্য' এবং 'অভিজ্ঞতা'কে কাজে লাগাতে চেয়েছেন তখন তার কবিতায় সে আমেজ আর ফিরে আসেনি, 'জন্মাষ্টমী' নামক অতি দীর্ঘ কবিতাটি, যেখানে তিনি স্পষ্টই, মনে হয়েছে আমাদের, মহাকাব্য রচনার ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন,

কাব্যগুণে ও রসাস্বাদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে (যেমন হয়েছে অন্যান্য দীর্ঘ কবিতা-গুলি যথা. চৈতে বৈশাখে. অম্বিষ্ট জল দাও)—নানাবিধ শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগেই যে কাব্যের স্বকীয় চরিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় না তা নিশ্চয়ই বিষ্ণু দে জানতেন, তথাপি এই সকল কবিতাগুলির সম্ভাবনা যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'ল তার কারণ, বিষ্ণু দে নিতান্তই গীতধর্মী কবি. রোমান্টিকতা তাঁর অস্থি মজ্জায় স্নায়ুতে—তার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের বিচারবোধ অথবা চিন্তাশীলতাকে কাব্যে উপজীব্য করা সম্ভব হয়নি। মেজাজ তার চিত্রকরের, ভাস্করের নয় ; ঠুংরী গানের খেয়ালখুশী বিস্তারে, ধ্রুপদী চালের নিয়মনিষ্ঠায় নয়। 'জাঁহবাজ', 'বকেয়া', 'ভুখোড়' 'ফটকা' ইত্যাদি শব্দ তিনি হয়ত সাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সময় সেনের মেজাজে যা সহজাত তাঁর চরিত্রে তা একান্তই অনুপস্থিত,—যে কারণে এ সকল শব্দ প্রায় অর্থহীন থেকে গেছে, তাঁর কাব্যে নতুনতর স্বাদ আরোপ করেনি। বিভিন্ন সময়ে চেতনার নিরিখে উল্লিখিত কবিতাগুলি এক স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, কিন্তু যেহেতু চেতনাগুলি মনের বিভিন্ন বিকাশের সমধর্মী নয়, সেহেতু পাঠকচিত্তে তা কোন সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। একটি উদাহরণ তুলে দিই :

> লেনিনের চিঠি পড়েছো, রিমার্ক—
> এব্‌ল্‌ ইন্‌—
> টারেষ্টিং।
> বলো ভাববেনা পাগল সং ? আচ্ছা, না-হয় হেসো। .
> কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
> অলকা, আমার দিন-রজনীর স্বপ্ন ভাসে
> নিদ্রাহীন
> পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
> —ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খসরু বেগ ?

বাংলা কেন ইংরেজি কাব্যকলাতেও, চতুরালি চিরকাল বচে পায়নি—প্রথমে যদিও খানিকটা চোখ ধাঁধায়। কামিংস্‌ এর প্রয়াসের কোন ঐতিহ্য আজকের দিনেও প্রবহমান বলে জানা নেই, অন্ত পক্ষে নানারকম অভিজ্ঞতা বা দেখাশোনার টুকরো টুকরো বিন্যাস-এ কবিতাকে পোষাক পরালেই যে সে প্রাণ পাবে (এলিয়ট পেয়েছেন বলেই ?) তার বিশ্বাস কি ? এলিয়ট যে

তার 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে একটি সমগ্র রূপ দেবার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন তার প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে—যা বিষ্ণু দে-র কবিতায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথমত তিনি একটি বিশিষ্ট প্রতীক এর সাহায্য নিয়েছিলেন; ফলত বার বার ঘুরে ফিরে তাকে কতগুলি ঘনিষ্ট চিত্রকল্পের (associate image) সুনিপুণ প্রয়োগ এর 'পর আস্থা রাখতে হয়েছে, দ্বিতীয়ত তার স্মরণে একথা ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তায় তিনি পৌছেছেন তাকে কাব্যে রূপদান করতে গেলে (দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করা সত্ত্বেও) প্রথমত প্রয়োজন পুরোপুরি তত্ত্বকথারই নির্বাসন। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-কে 'এলিয়ট-ভক্ত' বলে চিহ্নিত করলেও, কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সে প্রমাণ দিতে পারেন নি, (অবশ্য এলিয়ট তিনি পড়তে ভালবাসেন, তার অনুবাদ-গ্রন্থই সে সাক্ষ্য দান করছে) আর তাহলে এলিয়টের চরিত্রের ক্লাসিক ঋজুতার কথা, চিন্তার বলিষ্ঠ স্বকীয়তার কথা মনে রাখতেন, কবিতায় যার প্রতিফলন স্বাভাবিক হ'ত।

অথচ একটি ছোট কবিতার উল্লেখ করি যেখানে বিষ্ণু দে-র কবিকৃতির সরল স্বাক্ষর মিলবে; এ কবিতাটি হয়ত তার উচ্চাভিলাষী রচনা নয়, কিন্তু মমতা ও অভিজ্ঞতায় রোমান্টিক কবির সহজাত আবেগপ্রবণতায় এটি উজ্জ্বল-চিহ্নিত:

> তুমি কি দেখেছো তাঁকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?
> পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক
> তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
> মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ;

এবং অন্যত্র

> সততার আশা দীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে
> হিরণ্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কি? খুঁজেছো স্বদেশ?

এ কবিতায় প্রাজ্ঞতার ছাপ রয়েছে, দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারা যায় তিনি সার্থক কল্পনার সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাত্মকরণে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানকালের নানা ঘটনা, সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ের ইঙ্গিত, চাষী মজুর ক্ষেত খামারের উল্লেখ, বস্তী কারখানার বর্ণনা দিয়ে তিনি কবিতার পরিধি বিস্তৃত করতে

চেয়েছেন হয়ত, কিন্তু সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন; কেননা সহজাত বোধ থেকে কি এমন উক্তি সম্ভব ?

তাকেই ত খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে।

এবং একথা স্বীকার্য এমন সরলীকৃত উক্তিকে সম্পাদকীয়র পর্যায়ভুক্ত করলে অন্যায় হবে না। অথচ যখন তিনি বলেন

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে

তখন সংশয় থাকে না তার কবিতার প্রকৃত উৎস কোথায়।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর এবং তারপর সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, আলেখ্য) কবিতাগুলিতে একটি নরম সুর বাজছে সারাক্ষণ; রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি এক পাশে ঠেলে তিনি নিমগ্ন হবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সে আবেগ, সে-প্রাণের দাহন নেই—এ অনেক শান্ত, প্রায়-স্তিমিত। তবু তিনি তার নিজের জগতেই ফিরে আসতে চাচ্ছেন। এ প্রয়াসের পেছনে যদি জীবন-চেতনার স্পর্শ লেগে থাকে তবে তাকে অস্বীকার করবার সাধ্য কি ? আশা করা যাক্ পরবর্তীকালে তিনি স্বধর্ম চিনতে ভুল করবেন না।

৩

সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য যে যুগে কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়-একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যকে কূপমণ্ডূকতার গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে বিস্তীর্ণ ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন—এবং সাহিত্যের মানদণ্ড এমন এক স্থানে এনে দিয়েছিলেন যে কবিযশঃপ্রার্থীকে ছন্দ আর মিলের দিকেই শুধু লক্ষ্য রাখলে চলত না, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প ও পরিশেষ ব্যঞ্জনার দিকেও অশেষ সতর্কতা রাখতে হ'ত। অর্থাৎ সাধারণভাবেই সাহিত্যচর্চা অনেক দুরূহ বিষয় বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না এবং কবির কাজও সমপরিমাণেই কষ্টসাধ্য হ'ল। সৌখীন কাব্যরচনার যুগ অবসিত হয়ে কবিকে পরিশ্রমী, চিন্তাশীল ও মিতব্যয়ী হ'তে হ'ল। রবীন্দ্রনাথই যে এজন্য পূর্ণমাত্রায় দায়ী এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—এবং যেহেতু সেকালে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই ব্রাউনিং, বা ম্যাথ্যু

আর্নল্ড পড়তেন, পড়তে ভালবাসতেন এবং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্ত প্রভৃতি কবিরা নিজেরাই বিদেশী কাব্যের অনুবাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু বাংলা কাব্যের ভৌগোলিক মানচিত্র কিছু বিস্তৃত হ'ল সন্দেহ নেই।

ক্লাসিক চরিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ট্রাডিশনে আস্থাস্থাপন এবং এ বিষয় সন্দেহাতীত যে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাননি। তিনি যে বাংলা কবিতার সরল গতিপথকে স্বীকার করেই কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে আচমকা কিছু করবার বা আসরে বাজী মাৎ করবার কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, অসীম ধৈর্য্যে; কেননা কাব্যকলায় নিষ্ঠা ও নিয়মতন্ত্রের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ আনলেন তা সকল দেশের সকল কালের শিক্ষানবীশী কবির পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। এই শিক্ষার মূল্যবান দিনগুলোকে তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রমাণস্বরূপ তাঁর কবিতার যে কোন দুটি পংক্তি উদ্ধার করে দেখান যেতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা কবিতার এই বিস্তীর্ণতাকে এড়িয়ে চলেননি, বরং অভিনন্দিত করেছেন তেমনি ট্রাডিশনকেও সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেছেন। ফলত তার কাব্যে যে দুরূহতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তা উগ্র আধুনিকতার নয়। তিনি আশা করতেন, কবি যেমন শব্দচয়নে পরিশ্রমী হবেন, চিন্তার সাযুজ্য অব্যাহত রাখবার জন্য তৎপর হবেন, পাঠকও তেমনি কাব্য-উপলব্ধির জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হবেন; সৌখীন কাব্যরচনা যেহেতু তার পক্ষে অবাস্তব কল্পনামাত্র সৌখীন পাঠকের দায়িত্বহীনতাও তেমনি তার কাছে অবাঞ্ছিত—সুতরাং দুরূহতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠলেও তিনি কাব্য-রচনায় স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। আত্মবিশ্বাস যে কোন শিল্পসৃষ্টির প্রধান সর্ত, এবং যুগধর্ম অনুযায়ী বিচার বিবেচনায় অনেক সময় শিল্পীকে দুর্বোধ্য মনে হলেও কালধর্মের স্বীকৃতি যে তারা বহু সময়েই লাভ করে থাকেন এমন নজির ইতিহাসে বিরল নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,—তিনি দুর্বল incompetent কবি হতে লজ্জা পান (চতুরঙ্গ, বৈশাখ, ১৩৬১); একথা সঠিক বিচার-প্রসূত নয়, বরং সাধারণভাবে রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যকলা, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে অনুসৃত হয়েই, উৎকর্ষ ও প্রয়োগনিপুণতায় যে উন্নতমানে অধিষ্ঠিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ গুণটি শুধু যে

তাঁরই একলার তা নয়, বিগত তিন দশকের সকল কবিই অল্পবিস্তর এ বিষয়ে তৎপর; কেননা, তাঁরা জেনেছেন, বাংলা কবিতার বিচার আজকের দিনে শুধু ঈশ্বর গুপ্তের প্রেক্ষিতে হবে না, সে সঙ্গে ইংরেজি ফরাসী জর্মন কবিদেরও টান পড়বে। এবং সুধীন্দ্রনাথ অন্য সকল কবিদের চেয়ে যে বেশীরকম নিয়মনিষ্ঠ ও উদ্যোগী তারও কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁর চরিত্র নির্বিশেষে নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণেই পরাঙ্মুখ। ধৈর্য ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে শিল্পসৃষ্টি তাতেই তাঁর আস্থা বেশী, কেননা শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য শুধুমাত্র কবির ব্যবহারিক কলাকৌশলের 'পর নির্ভরশীল নয়, মনের মিশ্র ধ্যানধারণাও সে জন্য অনেকাংশে দায়ী।

একথা যদি স্বীকৃত হয়, নিয়মনিষ্ঠা ও কবির তৎগত আত্মচিন্তা ক্লাসিসিজমের লক্ষণ তাহলে অবশ্যই রোমান্টিকতা স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন—এমত বিচার অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন। বস্তুত রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবির মূলত কোন বিরোধ নেই এবং স্বেচ্ছাচারিতা যদি খেয়ালখুশীরই নামান্তর তবে কোন মহৎ কাব্যই এরূপ ধারণায় সম্ভব নয়। শিবনারায়ণ রায় তার একটি মূল্যবান প্রবন্ধে এরূপ উল্লেখ করেছিলেন যে ক্লাসিকের ধ্যেয় রূপ, রোমান্টিকের সাধনা প্রকাশ (শিবনারায়ণ রায় : ক্লাসিক ও রোমান্টিক ॥ উত্তরসূরী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)। অবশ্যই এ মন্তব্যে বিরোধের আশংকা নেই, কিন্তু 'রূপ'-চিন্তা শুধু যে ক্লাসিসিস্টের অথবা 'প্রকাশ'এর সাধনায় শুধু রোমান্টিকেরই অধিকার এমন উক্তি পুরোপুরি মেনে নেওয়া কষ্টকর। রূপের প্রকারভেদ আছে, যেমন রয়েছে প্রকাশ-রীতির; এবং মনে হয়, ক্লাসিক ও রোমান্টিকের প্রভেদ চিন্তায় নয়, অনুচিন্তায়; বিষয়ে নয়, বিষয়ের যাথার্থবোধে। অর্থাৎ রূপচিন্তা যেমন ক্লাসিসিস্টের লক্ষণ, প্রকাশ তার অনুষংগ; অন্যত্র রোমান্টিসিস্টের পক্ষে রূপের প্রসঙ্গ নির্বাসনে রেখে কেবলমাত্র প্রকাশের সাধনায় নিমগ্ন হওয়া সম্ভব নয়। কীটস্‌কে রোমান্টিক কবি বলেই ইংরেজী সাহিত্যে চিহ্নিত করা হয়েছে, অথচ তার অনুপম odes গুলি কি 'রূপ' এর ধ্যান নয়, শুধুমাত্র অভিব্যক্তি? আমার ত' মনে হয়েছে এলিয়টকে ক্লাসিক কবি আখ্যা দিলে যেমন সত্যের অপলাপ হবে না তেমনি রোমান্টিক কবি বললেও অধ্যাপকেরা নম্বর কাটবেন না। অবশ্যই, প্রভেদ আছে—কিন্তু সে প্রভেদ জীবনধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে দৃষ্টিকোণের পার্থক্য সূচিত করেছে। অর্থাৎ

সমগ্র জীবনের চিন্তাভাবনায়, দেখাশোনায়, অনুভূতি অভিজ্ঞতায় দুটি দিক রয়েছে—একদিক বিজ্ঞানীর, অন্যটি দার্শনিকের। বিজ্ঞান কোন কিছু 'নিশ্চিত' জ্ঞানে বিশ্বাস করে না, নতুনের সন্ধানে সে আলস্যহীন, কর্মচঞ্চল, তৎপর। ঘর বাঁধবার আগ্রহ যদি বা তার থাকে, ঘর ভাঙবার জন্য সে কম উৎসুক নয়। অন্যত্র, দার্শনিকের অভিসন্ধি এই বিশেষ জ্ঞানের আত্মগত ধ্যান ও আত্মশুদ্ধির 'পর। অর্থাৎ তার চরিত্র নিরাসক্ত পুরুষের—যা দুঃখে বিভ্রান্ত হয় না, সুখে অচঞ্চল থাকে, যে ব্যক্তি ভোগের আনন্দ আস্বাদ করেও বিগতস্পৃহ। জীবন-ধর্মকে গ্রহণ করায় যে চারিত্রিক পার্থক্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকে বর্তমান, তা সমভাবেই রোমান্টিক ও ক্লাসিক কবিতে পরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথের মত কবি যখন 'আত্মশুদ্ধি'তে সবিশেষ আস্থা পোষণ করেন তখন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ধ্রুব লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি যেমন নিবদ্ধ, সাময়িক বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও তিনি তদ্রূপ নিরুৎসাহ।

এবং এরূপ বিচার প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে নিজের কবিতার কাব্যাদর্শের ভূমিকা তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। 'অর্কেষ্ট্রা'র পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ও তাঁর নতুন গ্রন্থ 'সংবর্ত' অল্পদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এবং দুটি পুস্তকে তিনি অতি মূল্যবান, যদিচ সংক্ষিপ্ত, ভূমিকা লিখেছেন। কাব্যরচনা বিষয়ে তার বক্তব্য দুটি ভূমিকা থেকেই যথাযথ বোঝা যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং 'অর্কেষ্ট্রা'র ভূমিকাতে তিনি যখন স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন 'স্বরচিত নিয়মের অঙ্গীকারেই আমার মুক্তি' তখন তাঁর বিবেক-কে স্বীকার করলে কাব্যের রসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটবে না, বরং উক্তি ও প্রকাশভঙ্গির সাযুজ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যাবে হয়ত। সে কারণে তার বক্তব্যগুলিকে টীকা আকারে উপস্থিত করে তার কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ নিলেই মনে হয় সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। ভূমিকা দুটিতে এতটা মূল্য আরোপ করবার পেছনে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমত, সুধীন্দ্রনাথ গদ্য কম লেখেন এবং গদ্য বলতে তিনি যুক্তি-আশ্রয়ী লেখাই মনে করেন। সেহেতু, তিনি যাই লিখুন, আমাদের স্বীকৃতির অপেক্ষা না রাখলেও, তা সম্পূর্ণ অর্থবহ। দ্বিতীয়ত, নিজের কাব্যকলার প্রেক্ষিতে এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, সত্যভাষণকে যেমন মানদণ্ড করেছেন, অতিশয়োক্তিকে তেমনি বর্জন করতে দ্বিধা করেননি।

মালার্মের চিন্তা অনুসরণ করে তিনি তার কাব্যাদর্শ স্থির করেছেন যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ। অবশ্য শুধুমাত্র একথায় মতামতই প্রকাশ পায়, অর্থ ঘনিষ্ঠ হয়না। তবু ধরে নিতে পারি যে শব্দের ব্যবহার এবং প্রয়োগ-নিপুনতার পর কবি অনেকটাই নির্ভরশীল। মালার্মে, যতদূর জানি, 'logical statement' কে কবিতার অঙ্গীভূত করতে চাননি, অথচ শব্দের অর্থবহতায়, চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষমতায় তার কলাবৈকল্য এখানে শিক্ষনীয়। হয়ত সেকারণে তার বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি ধ্বনিসুষমায় গ্রথিত হয়ে মনের অবচেতনাকেই বেশী স্পর্শ করত। সাধারণ কাব্যপাঠক এখানে বিভ্রান্ত হবেন, কেননা সুধীন্দ্রনাথের কবিতা স্পষ্টতই, এর বিরোধী না হলেও, ব্যতিক্রম। একথা ঠিক যে মালার্মে যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য একান্তই নিজস্ব শব্দসম্ভারের সন্ধানে বহু সময় ব্যয় করেছেন, সুধীন্দ্রনাথও একটি শব্দ বা ঢিলেঢালা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ অর্থবহ বিশেষণ ব্যবহারের প্রচেষ্টায় দিনরজনী অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু এ মিল শুধুমাত্র প্রকরণগত, নিতান্তই বাহ্যিক; মালার্মে কবিতার মুখ্য উপাদান হিসেবে যে শব্দ ব্যবহারের ওপর এতটা জোর দিয়েছেন তা স্বীকার করতে হলে তার কাব্যের পরিমণ্ডলকে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রতীকী কাব্যের আশ্রয়ে তাকে রুদ্ধগতি স্বপ্ন-ইশারা-চৈতন্যের মুক্তি কামনা করতে হয়েছে। 'হেরোডিয়াস্' অথবা 'ফনের দিবাস্বপ্ন' কবিতাটিতে অথবা ছোট ছোট সনেটগুলিতে তিনি যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন সেখানে তার নিজস্ব শব্দ ও চিত্রকল্প ব্যবহার না করে অন্য উপায় ছিলনা, কেননা চিরাচরিত প্রথায় শব্দের অর্থকে গ্রহন করলে ও ব্যবহারের রীতিতে আস্থাবান হলে তিনি যে বিশিষ্ট ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হ'ত :—

> Poetry must not be fettered by the use of words in their customary context, the static image dear to the Parnassians is liberated by an idea of flight or even absence, the sentient must be rendered by the auditory and silence cultivated as a capacity for music.

কোন বস্তুর সরাসরি উল্লেখে তার কাব্যগুণ বিনষ্ট হবে মাত্র, সমান্তরাল

অন্ত কোন সমগুণাত্মক চিত্র ব্যবহারেই কাব্যমাধুর্য বেশী প্রকাশ পাবে। একথার যথার্থতা প্রমানিত হবে 'ফনের দিবাস্বপ্ন' নামক অনূদিত কবিতাটির ভাষ্যে—সুধীন্দ্রনাথ যেখানে নিজেই স্বীকার করেছেন, মালার্মের কাছে শিল্প-সামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। এবং সেকারণে ঐকান্তিক ভাবনাকে যথাযথ রূপদান করতে গিয়ে প্রতিটি শব্দের নতুন অর্থবহতায় তাকে সচেষ্ট হতে হয়েছে। হেরোডিয়াস্ এর বিশুদ্ধতা যখন ক্রমশই অভিজ্ঞতার সাহচর্যে নতুন চরিত্র লাভ করছিল, নার্সের সামান্যতম ইঙ্গিত ইশারা ও আচরণে সে অভিভূত হয়ে পড়ছিল তখন এই সূক্ষ্ম নিমগ্ন অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য তাকে যে ভাষার, যে চিত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে তা একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। Anguish কবিতাটিতে

I ask of your bed *heavy sleep* without dreams

অথবা Apparition এ

In the evening, you in laughter appeared to me

And I thought I saw the *fairy with her cap of brightness*

উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তিনি যখন বিভিন্ন ইঙ্গিতের আশ্রয় নেন তার যাথার্থ অনুসরণ করতে গেলে তার কবিতার ছড়ানো আকাশকে, আলো আঁধারকে তখন দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে হবে। তিনি যে বিশুদ্ধ কবি সেকথা রজার ফ্রাই স্বীকার করতে গিয়ে 'pure poet' ও poetical poet' এর পার্থক্য অনুসন্ধান করেছেন :

> The poetical poet makes use of words and material already consecrated by poetry, and with this he ornaments and embroiders his own theme. Mallarme's method is the opposite of this. His poetry is the unfolding of something implicit in the theme.

এর বিষয়বস্তু অনুধ্যানে তিনি বিভিন্ন নতুন শব্দ, চিত্র ও রূপকল্পের সন্ধান পান ; এমনকি 'unsuspected relations' খুঁজে বার করেন। মালার্মের দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে অন্ত এক বিদগ্ধ সমালোচক প্রস্তাব করেছেন যে, একে স্বাকার করেই তার কবিতার অর্থ খুজতে হবে। কেননা এই দুর্বোধ্যতা ইচ্ছাকৃত নয়, যেহেতু it derives from the strangeness of a mode

thought turned back upon itself—সেক্ষেত্রে যে সকল 'mystery' বা 'obsession' তার কাব্যের অন্তর্গত হয়েছে তাকে উদ্ধার করা কাব্য পাঠকের দায়িত্ব, বিশেষত যেখানে মালার্মে এমত অবস্থায় নিরুপায় ভাবেই শব্দব্যবহারে নিজ বিশ্বাস ও কল্পনার 'পর আস্থা রেখেছেন।

অপরপক্ষে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস সন্ধানে তৎপর কোন পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এ হেন কাব্যের পরিমণ্ডলে তিনি নিজের কাব্যকে দাঁড় করান নি। প্রত্যেক কবির কবিতার ভাষা বিশিষ্ট এবং তার চিন্তা ও ধারণার 'পর সে ভাষা নির্ভরশীল। সুধীন্দ্রনাথের জগৎ মালার্মের জগৎ নয়; যে অর্থে শব্দের নতুন সম্ভাবনাকে মালার্মে স্বাগত জানিয়েছেন সে অর্থে সুধীন্দ্রনাথ শব্দের ব্যবহার করেননি। যেমন তার অপূর্ব চারিটি পংক্তি,—

একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

এমন ভাবগম্ভীর অর্থবহ অথচ কাব্যের পূর্ণ সুষমামণ্ডিত পংক্তি, বাংলা কাব্যের পরিধিতে যত্রতত্র মিলবেনা; তথাপি স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এ নিতান্তই অন্য জাতের, অন্য মেজাজের কবিতা। দৃঢ়বদ্ধ, যুক্তি-আশ্রয়ী অথচ আবেগধর্মী শব্দের যথাযত বুনুনিতে এর নিশ্চিত পরিণতি। অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য কাব্যের থেকে এ শতযোজন দূরে (এটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা এবং যদিচ সুধীন্দ্রনাথ পরবর্তী সংস্করণে 'ভর করেছিল'র পরিবর্তে 'বাসা বেঁধেছিল' এমন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সুখী হয়েছেন তথাপি কাব্যপাঠক হিসাবে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হইনি)। তার প্রেমের ধারণায় mystery বা obsession এর কোন স্থান নেই, 'flight into idea' যদিবা রয়েছে—সে idea প্লেটোনিক তত্ত্বের ধারা দিয়েই যায়নি; 'হৈমন্তী' কবিতাটির শেষে তিনি এমন ঘোষণা করতে ইতস্তত করেননি:

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজি আর ফিরিবনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥

পরন্তু তিনি নিজেই ভূমিকাটিতে স্বীকার করেছেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যথাশক্তি অনুশীলনের ফলেই তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে

পৌঁছেছেন। মালার্মের কাব্যাদর্শে এমন কোনরূপ সুসঙ্গত logical deduction পাওয়া গেছে কিনা জানিনা. কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকে সুরু করে আজো পর্যন্ত মানব ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করে যে বিশেষ সত্যদর্শনে পৌঁছুবার চেষ্টা করেছেন মালার্মের কাব্যে সেমত কোন প্রয়াস নেই। এবং তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসার আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য' হলেও, যেহেতু একটি অন্যটির পরিপূরক সেহেতু আধার-আধেয়ের মৈত্রী স্বীকার না করলে কবিতা শেষ পর্যন্ত জিম্‌নাষ্টিক্ হয়েই দাঁড়ায়। সুধীন্দ্রনাথ এবং মালার্মে দুজনাই নিজ নিজ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং যখন দুজনার আধেয়ের স্বরূপ ভিন্ন, আধারও স্পষ্টতই একই লয়ে গ্রথিত নয়। একারণে সুধীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী' থেকেও অনুরূপ পংক্তি উদ্ধার করে দেখান যেতে পারে যে তাঁর প্রস্তাবিত কাব্যাদর্শ অন্তত তার নিজস্ব কাব্যচর্চায় প্রতিফলিত সিদ্ধান্ত কখনো নয়।

অথচ ভূমিকা দুটিতে তিনি অন্য যে সকল সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সায় রয়েছে এবং সুধীন্দ্রনাথের যে কোন উৎসাহী পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে কেন তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুপষ্ট' অথবা 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা'। বস্তুত পূর্বে যা যা বর্ণিত হয়েছে এসকল কথা তারই সংহত সংজ্ঞা। প্রথম কবিতাগ্রন্থগুলি যথা 'তন্বী', 'অর্কেষ্ট্রা' বা 'ক্রন্দসী' থেকে 'সংবর্ত' বা 'দশমী' পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রচেষ্টায় 'ব্যক্তি' সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই 'ব্যক্তি' সর্বশেষে 'মানব' এমন বিশেষণ লাভ করেছে। প্রেম অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত হয়ে ব্যক্তিগত সুরকে অতিক্রম করে 'বিশ্ববীক্ষা'য় স্থান লাভ করেছে। সুতরাং তাঁর কাব্যে দার্শনিক জিজ্ঞাসার ক্রম-উত্তরণ রয়েছে ; যিনি সুরুতে বলতে পেরেছিলেন 'সম্মুখে নিখিল নাস্তি' পরে তিনিই স্বধর্মে আস্থা রাখতে দ্বিধাবোধ করেননি :

> বিপরীত স্রোতে
> সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও
> ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়॥ (জেসন্। সংবর্ত)

উটপাখী যে একক মানুষের নিঃসঙ্গতার প্রতীক সেকথায় যেমন তিনি প্রারম্ভেই

ইঙ্গিত দিয়েছেন তেমনি অভিজ্ঞতার দ্বারা জেনেছেন 'একনায়কের স্তবে মেদিনী মুখর'হলেও বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বের জন্যই ও দ্বন্দ্ব তাণ্ডবে' যোগ দিতে হবে। জীবনের একদিকে নিষ্ঠুর নৈরাশ্য অন্যপক্ষে মানুষের দুরূহ প্রচেষ্টা—এর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত নন। 'ক্রন্দসী' 'অর্কেস্ট্রার' যুগে তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য ছিল প্রেম; এবং তাঁর পরিকল্পিত নারী ছলনাময়ী, তীব্র সুরার আস্বাদনে সে পুরুষকে আকৃষ্ট করে, কেননা যৌবনময়ী নারী আরণ্যক দুর্দাম পুরুষের সঙ্গিনী হতে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তখনও তার অপর সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতাকে স্মরণে রেখেছেন:

তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়

বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্যের কাছে কি প্রেম, কি জীবনজিজ্ঞাসা কিছুই অবশ্য চিরকালের স্থির দর্শন নয়, তথাপি 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা'র স্তর অতিক্রম করে যখন তিনি 'কাব্যগত অভিজ্ঞা'য় পৌঁছেছেন তখন তিনি অস্থির যুবকের পরিণতি বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকায় নিশ্চিত জেনেছেন

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কাণাকড়ি মিলিবেনা যবে
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেইদিন মহাসত্য হবে।

অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় প্রেম জীবনের বিরাট সত্যরূপে প্রতিভাত যদিচ 'অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়'– এমন মর্মান্তিক সত্যভাষণ শূন্যবাদেরই নামান্তর বুঝিবা। প্রেমের কবিতার পরেও যখন তিনি মূল্যবোধের কথা ভেবেছেন তখন তাঁর তৎকালীন কবিতায় একটি সচেতন মনের বিকাশ ধরা পড়েছে—যে-মন ব্যক্তিজীবন ও ব্যষ্টিজীবনের নানা সমস্যার আপাত সমাধানকে চরম বলে গ্রহণ করেনি, বরং একটি স্থির দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রয়াস করেছে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিত, তার নায়ক ব্যক্তিপুরুষ যার অন্তরে 'উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকার' এবং যে একলা 'ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে' 'চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার' ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। 'উত্তরফাল্গুনী'র কবিতাতেও সেই সুর বার বার ফিরে এসেছে, যেমন,

হৃদয় তবু বিষাদে ভরে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই—

প্রেম-বিষয়ক কবিতাবলীতে সুধীন্দ্রনাথের একটি সুস্থ সুন্দর লিরিক্যাল

মেজাজ পাওয়া যায়; বিভিন্ন কবিতার কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি :

তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে

এবং নান্দীমুখ' কবিতাটির অন্যত্র

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর,
মৎসর প্রেত-পারা,

(অবশ্য এ কবিতাটি ব্যক্তি-প্রেম থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবিক পটভূমি আশ্রয় করেছে); 'সংবর্ত'র সুরুতে

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে

অথবা

তোমার আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহেনা

এমন সকল পংক্তি যে কোন রোমান্টিক কবি লিখতে পারলে খুশী হতেন। লিরিসিজম্ বাংলা কাব্যের পটভূমি; সুধীন্দ্রনাথ, ক্লাসিক ঋজুতায় অভ্যস্ত হয়েও, এ আশ্রয়ে মাঝে মাছে নিশ্চিন্তি লাভ করেছেন।

'সংবর্ত'র কবিতাগুলিতে বা 'দশমী'র, দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি, দর্শন ও জীবনজিজ্ঞাসা বৈশ্বিক পটভূমি আশ্রয় করেছে—তাঁর উদ্বেল অনুসন্ধিৎসা আমাদেরও পীড়িত করে। এমন ধারণা হয়, মানব-মানবীর প্রেম ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভালবাসায় শেষ নয়; জগৎ সংসারের বিরাট ইতিহাসে সে কাহিনীরও যথার্থ স্থান অবশ্যই আছে, অঙ্গাঙ্গী হয়ে, এবং পরিপূরক হিসেবে। তাঁর জীবনধর্মের সঙ্গে তাঁর কাব্যের এক আশু সমীকরণ ঘটেছে—সেজন্য কাব্য সুষমা তাঁর ক্ষেত্রে স্ব-অভিজ্ঞতায় সত্যদর্শনের নামান্তর। ইতিহাস অথবা 'অপমৃত ভগবান', মানব সভ্যতা অথবা তার বিকল্প যেন সব কিছুতেই তাঁর চিন্তা তন্নিষ্ট, কেননা তিনি 'বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক'; এবং 'বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী' হয়ে তিনিই জেনেছেন, বিশ্ববীক্ষা এবং তৎসংলগ্ন সমাজ সমস্যার নানাবিধ রূপ,—প্রগতি অথবা পশ্চাদ্‌গতির,—বিভিন্ন সত্যাসত্যের সাহসী জিজ্ঞাসাতে ফলবতী হয়।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতগুলি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'এর প্রকাশকাল মাত্র কয়েকবছর আগে। এবং এই দীর্ঘদিন ধরে, তিনি আর যাই করুন না কেন, কবিতার নিরলস চর্চা থেকে বিরত হননি। উত্তরকালে কবিদের কাছে এ নিষ্ঠার মূল্য বড় কম নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তার কবিতায় পরিণত বয়সের স্বাক্ষর নেই, আবেগ ও চিন্তার সমীকরণে যে মূল্যবোধের জন্ম, তার স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নেই। তিনি শব্দের ব্যবহারে পরিশ্রমী, কুসংস্কারগ্রস্থ প্রচীনত্বকে নির্দয়ভাবে বর্জন করতে দ্বিধাহীন; অথচ শব্দের যে আশ্চর্য ইঙ্গিতময় ব্যবহারে কবিতার শরীরে অপরূপ লাবণ্য জন্মায় তার চৈতন্যগত উপলব্ধিতে সন্দিগ্ধমনা। ধরা যাক বহু বছরের ব্যবধানে রচিত তার দুটি কবিতার অংশ:

নির্বোধের মত চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে—তুমি আমার, আমার!
দ্যাখো, এই তো আমার ভালোবাসা, যা আমি দিতে পারি,
এতে উন্মত্ততা, এতে সর্বনাশ, এ-কি তোমার সইবে?

(দয়াময়ী মহিলা)

মনে হয়, আমার তনুর তন্তুতে, সীবনে
যে-কবিতা, কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে মনে নারীরে মৃণাল ক'রে: মনে হয় নারীরে
বেসেছি ভালো,

যেহেতু কবিতা
জেগেছে, জ্বলেছে তার চোখ থেকে—সে নিজে বোঝেনি।

(মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে)

ওপরের উদ্ধৃতি দুটি যে একই কবির বিভিন্ন কবিতার অংশ কুশলী কাব্য পাঠকের কাছে তা সম্ভবত ধরা পড়বে। অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় তার স্বকীয় বিশিষ্টতা বর্তমান, উপরন্তু তিনি যে একটি বিশেষ চারিত্রশক্তি অর্জন

করেছেন এও নিঃসন্দেহ। কিন্তু কাব্যবিচারে তাই শেষ কথা নয়। ক্যারাক্‌টার ও পারসোনালাটির যে প্রভেদ হার্বার্ট রীড তার চিন্তাপূর্ণ আলোচনায় বিশদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন তার অনুধ্যান একথাই প্রমাণ করবে যে বুদ্ধদেব বসু কাব্যের আবেগ ও কাব্যের উচ্ছ্বাসের দিকেই নিজের কাব্যের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন; কবিচরিত্রে যে সুদৃঢ় চিন্তানিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নিঃসংশয় প্রতিফলন আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত নন এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে 'প্রেরণা' নামক বস্তুকে ভয় করে এসেছেন, বুদ্ধদেব বসু, পরিশ্রমী কবি হলেও, তার অন্যায় শুচিবায়ু-গ্রস্থতা থেকে মুক্ত নন। এমন অভিযোগ করি না যে জীবনানন্দের অপূর্ব তন্ময়তা তরে কাব্যে নেই কেন অথবা সুধীন্দ্রনাথের নৈয়ায়িক প্রাজ্ঞ বিবেচনা-প্রসূত জীবন চিন্তার বিকাশ কেন সেখানে অনুপস্থিত—তবু একথাও স্বতঃই মনে আসে,—বুদ্ধদেব বসুর—যার কবিতা আমরা ভালবাসি, যার রচনার বহু অংশ আমাদের মুখে মুখে ছাত্রজীবন থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছে—কাব্য শুধুমাত্র memorable speech হয়েই স্মরণে থাকবে? কঙ্কা কঙ্কা, কঙ্কাবতী—এই অপূর্ব ধ্বনির রেশ কৈশোরের শেষে যেমন মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল আজও তাই করবে? আমার পূর্ববর্তী কোন সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে adolescence এর দায়ে অভিযুক্ত (?) করেছেন,—যেমন একদা এলিয়ট করেছিলেন শেলীকে—অবশ্যই তা সম্পূর্ণ স্বীকার করা সম্ভব নয়; তবু পঁচিশ বছরেই কীট্‌স্ যে জীবন-চিন্তার গাঢ় পটভূমিকে আশ্রয় করতে পেরেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু কি পঞ্চাশের তীরে উপনীত হয়েও তার অংশমাত্র আমাদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছেন? 'স্মরণীয় উক্তি'ই কবিতার একমাত্র বর্ণনা হলে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কবিকে কেউ মনে রাখতোনা এবং বহু অখ্যাত কবি প্রথম সারিতে স্থান পেতেন। এ উক্তির স্বপক্ষে ধরা যাক্ 'সাগরদোলা' কবিতাটি, যা প্রায় বিশ বছর আগেকার লেখা। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন "দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থের এক একটি কবিতা লিখতে বিস্তর সময় লেগেছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে...গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি।" 'বন্দীর বন্দনা' 'কঙ্কাবতী' কবি যেমন 'হু হু করে লিখেছিলেন,' হয়ত সেখানে আবেগের নিয়ন্ত্রণ ছিলনা, 'দময়ন্তী'তে এসে তিনি 'সচেতন' হয়েছেন। চিন্তার স্বাভাবিক সুস্থ নিয়মে কাব্যের রাশকে টেনে রেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, দীর্ঘদিন পরে প্রকাশিত

নতুন কাব্যগ্রন্থখানিতে সংযোজিত 'আকাশ পাতাল' কবিতাটি পূর্ব-উল্লিখিত কবিতাটির সঙ্গে পড়লে কোন পাঠকের কি মনে হবে, তিনি কাব্যবোধের দিক থেকে বেশী দূর অগ্রসর হয়েছেন? দুটো উদ্ধৃতি ধরা যাক্‌:

সারা দিন রাত হাজার ঢেউএর উচ্চস্বরে
অন্ধ অবোধ হাওয়ার ঝড়ে
কী যে লুটোপুটি ছুটোপুটি ওই ছোট্ট ঘরে
মনে কি পড়ে? মনে কি পড়ে? (.৯৩৮)

আমার মনের মত্ত আঁধারে হাজার কথার
ঘুম ভেঙে যায়, যেন পাখা পায়, আকাশ তারায়
বিশাল রাত্রে যেন উড়ে যায় হাজার হাওয়ায় (১৯৪৮)

দশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও সত্যি কতটুকু পরিবর্তন তাঁর লেখায় এসেছে? এবং প্রেমের কবিত, ধরা যাক্‌ চটুল ভঙ্গীতে লিখলেও, সত্যিই কি সব সময়ে সুখপাঠ্য:

আমি বসাবো তোমাকে মোর ইজি চেয়ারে
আমি বসবো পাশে (আমন্ত্রণ-রমাকে)

অথবা বর্ষার দিন বৃষ্টির প্রসঙ্গে

তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্র্যামে চড়ে বসি আপিশের অভিসারে
কেরাণীকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া (বর্ষার দিন)

অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসু, পরিণত কালেও, অপূর্ব উজ্জ্বল সুন্দর পংক্তির পাশেই এমনিতর হালকা পংক্তি অনায়াসে লিখে গেছেন। এরকম উদাহরণ তার কাব্যে অপ্রচুর নয়। অর্থাৎ এথেকে একটি মাত্র অনুযোগই করা যায়—এবং তা নিশ্চয়ই যে কোন কবির বিপক্ষেই বড় রকমের অনুযোগ—তার কাব্যে চিন্তার অস্বাভাবিক দৈন্য মনকে গভীর ভাবলোকে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়। কবিতা শুধুমাত্র শব্দের বুনুনি নয়, যদিও তিনি মনে করেন:

কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে আমি শুধু ভালোইবেসেছি
সব চেয়ে তীব্র মত্ত সত্য করে (মৃত্যুর পরে: জন্মের আগে)

মহৎ কবিতা বড় ভাবকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে ; এর আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। এলিয়ট এর Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধটিতে যে কথা বারবার উল্লিখিত আছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কবি-মানসের সেই অতি প্রয়োজনীয় দিকটিই অনুপস্থিত যা তার কাব্যকে বৃহৎ কাল-চৈতন্যের সমান্তরাল একটি সরল রেখায় বয়ে নিয়ে আসবে এবং অনিশ্চিত মানবভাগ্যের দায় যেখানে বারবার মাথা খুঁড়ে মরবে। বস্তুত কি কাব্যে বা সাহিত্যে এই প্রারম্ভিক বিয়োগ-চেতনা অনুপস্থিত থাকলে বড় শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে তাঁর উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হবে।)

তবু তাঁর কবিতা আমাদের ভালো লাগে, যেমন লাগে কোন সুন্দরী নারীর আকর্ষণকে, যদিও জানি সে কীটস্ এর দয়াহীনা নায়িকার মত। অর্থাৎ /বুদ্ধদেবের কবিতার এক আশ্চর্য দুর্নিবার আকর্ষণ আছে—সে আকর্ষণ নারীর আকর্ষণের মতই।) সে আকর্ষণ-এর কারণ নির্দেশ করতে গেলে ভিক্টর হুগোর বিরুদ্ধে গ্যতিয়ের চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে নিতে হয়।[১] বস্তুত ফর্মাল কবিতা হিসেবেই বুদ্ধদেবের কবিতা নির্দোষ এবং তাঁর কাব্যের যা প্রসাদগুণ তা তার দুর্দমনীয় প্রাণশক্তির প্রকাশে। 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি' অতিক্রম করে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত পড়ে গেলে তার কবিতায় একটি সুনির্দিষ্ট নিয়তিবোধের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে। তার যথাযথ বিবরণ দেওয়া গেল :

দেহ আত্মাকে বন্দী করে রেখেছে, সে বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় প্রেম। অন্যদিকে যৌবন ক্ষুধিত, বাসনার তীব্র হাহাকারে সমস্ত চেতনা বিভ্রান্ত, জীবন যেন যৌবনের প্রচণ্ডতম রূপ। তার ব্যথা বেদনা শুধু আর্তি ও হাহাকার ছাড়া কিছুই নয়, স্পর্শগন্ধময় পৃথিবীতে চেতনাও এক স্পর্শগন্ধময় অস্তিত্ব।

(বন্দীর বন্দনা থেকে কঙ্কাবতী)

দুঃখ আর বিলাস নয়, যখন যৌবন অপহৃত অতীতের বেদনা তাকে গ্রাস করতে আসছে। নিজের সৃষ্টির (কঙ্কা) মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন যৌবনের

---

১ Gautier rejected all moral, social and political implications in literature, demanding that a poem should be purely formal, and that art should be practised for its own sake.

(J. M. Cohen : A History of Western Literature).

চিহ্ন এবং অবরুদ্ধ প্রেমের মুক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। দেহগত জ্বালাময়ী মানুষী প্রেম, যা উদ্ধত গর্বিত যৌবনের সহচর ছিল, প্রৌঢ়ত্বে এসে অন্য একটি শান্ত আশ্রয় পেল (পেল কি ?)।

('দময়ন্তী' থেকে 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর')

অর্থাৎ যে বিক্ষোভ ও অশান্তি থেকে শান্তি ও আশ্রয়ের দিকে তাঁর পথচারণা তা প্রেমকেই কেন্দ্র করে ! এ প্রেম শরীরী ; নারীর প্রতি দ্বিধাহীন অসংকোচ ভালোবাসা। এতে লজ্জা নেই, কেননা এ জৈব, সৃষ্টির প্রাথমিক নিয়মের মতই এ স্বতঃসিদ্ধ—এ প্রেমই জীবনের নিয়তিবোধ ; কেননা এরই বৃন্তে মানুষের অভিজ্ঞান, শিক্ষা, ক্ষমা, মহত্ত্বের ধৈর্যের পরীক্ষা। বুদ্ধদেব প্রেমের কবি ; প্রেম ও অপ্রেম তাকে শিক্ষা দিয়েছে জীবনের জ্বালাময় দ্বন্দ্বময় রূপ ; যৌবনের অভিজ্ঞতা-লালিত জীবনের ও যৌবনোত্তর শরীরী ব্যর্থতায় তার কাব্যে এক নিদারুণ মত্ততা ও হাহাকার। এই হাহাকারই আমাদের তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যায়, তাঁকে আমাদের আপন করে, তাঁর কবিতা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তার কাব্যে romantic idealism নেই, পরিবর্তে রয়েছে romantic agony—সম্ভবত তার বোদলেয়র ও র‍্যাঁবো প্রীতির মূলে এই চেতনাই নিরন্তর কাজ করেছে।

আধুনিক কাব্যের প্রেক্ষিত : অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কাব্যে দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবহমান, একটি বিদ্রোহের, অন্যটি ঐতিহ্যবাহিত। যেখানে বিদ্রোহ সেখানে উচ্চকণ্ঠ, আত্মদৃপ্ত ঘোষণা এবং অনির্দিষ্ট পথচারণ, অন্যত্র স্নিগ্ধকণ্ঠ, স্বল্পোচ্চারিত, ঐতিহ্যলালিত প্রয়াস। অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই দ্বিতীয় ধারায় নিজেদের অন্বিষ্ট খুঁজেছেন। রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির ব্যর্থ প্রয়াস-এর সদম্ভ চিৎকার এঁদের কাব্যে শোনা যায় না, চুপি চুপি সকলের অগোচরেই যেন এঁরা এদের কবিকৃতিকে মেলে দিতে চেয়েছেন। যে-পাঠক রসজ্ঞ, যার ইন্দ্রিয় স্পর্শাতুর সে যেন নিজের দায়-দায়িত্বেই এঁদের খুঁজে বার করবেন। এবং বিস্মিত হবেন না, মুগ্ধ হবেন। কাব্যপ্রকাশের যে সহজ রাস্তাটি দিয়ে এঁরা চলাফেরা করেছেন তাতে পাঠকের দ্বিধা হয় না, সংকোচ হয় না, পরন্তু আত্মীয়তা ঘটতেও বিলম্ব হয় না। নরম অথচ স্পষ্ট গলায় এঁরা বলতে পেরেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার, অনুভাবনার, চেতনার কথা। সেখানে কল্পনা-প্রবণতার স্থান উঁচু সুরে বাঁধা যদিও, তথাপি, কল্পনাই যেহেতু কাব্যাস্বাদের সোদরপ্রতিম, তাঁদের কবিতা মনকে আঘাত করে না, আকর্ষণ করে। আধুনিক হবার উগ্র ইচ্ছায় এঁরা কখনই কাব্যের নির্দিষ্ট নিয়ম অযথা লঙ্ঘন করেননি, বিনয় স্নিগ্ধ বাচনিক-কৌশলে কাব্যের চেহারায় সরস ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত ; তার দ্যুতি চোখ ধাঁধায় না, বরং সে আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকল দিক। এবং যদিবা উভয়ের কল্পনা-চেতনায় প্রভেদ মৌল, অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে এঁরা দুঃসাহসিক রকমে রোমান্টিক। যে-কালে প্রায় স্বীকৃত ছিল যে চিরাচরিত রোমান্টিকতা কাব্যে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায় না তখনও এঁরা লিখতে দ্বিধাবোধ করেননি—

যেখানে রূপালী ঢেউএ দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা—কালো আঁখি সুদূরে উধাও ; (অজিত দত্ত)

বালুকাবলীতে প্রিয়ংবদারা প্রেত, তবু সবে 'হলা পিয় সহি হলা'
কোথায় সউম্বলা কোন দূর তীরন্দাজের দ্বীপে আজ পিঙ্গলা •
সপ্ত সিন্ধু—হিন্দোল ইরাবতীর গাত্রে, ছায়ায় শিহরে বেলা
অয়শ্চক্রে বয়ে যায় কতো তাকায় প্রহর বেলা (সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

বস্তুত 'পাতাল কন্যা' অথবা 'পদাবলী'র মত কবিতা-পুস্তক রচনা করা এ-যুগে বাস করে যে সম্ভব সে কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়। অবশ্যই এ নস্‌টালজিয়া একজনের ক্ষেত্রে রূপকথা ও অন্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্য-ইতিহাস-ভৌগোলিক সংস্থানের উপর নির্ভরশীল। এই আপাত প্রভেদের জন্য তাঁদের মানসিকতাই দায়ী বললে সত্যের অপলাপ হবে না এবং পাঠকের কাছে এর আবেদন বিভিন্ন কোণ থেকে বিচ্ছুরিত হলেও, ফলের কথা চিন্তা করলে বলা অসঙ্গত নয় যে—বিভিন্ন অনুভাবনা ও চেতনার স্তর অতিক্রম করেও এঁরা সমধর্মী কবি, বিশেষ করে উত্তর-তিরিশের যে তৎকালীন সমাজ-চেতনা-প্রসূত কাব্যবোধের সোচ্চার সরবে শুনতে পেতুম, এঁরা অনায়াসেই, সে স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে, স্ব স্ব চরিত্রে দৃঢ়চিত্ত হয়ে কাব্যের মূল সূত্র অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অজিত দত্ত উপস্থিত সাময়িকভাবে কাব্যচর্চা থেকে নিবৃত্ত থাকলেও তিনি যে আবার লিখবেন সে আশা আমাদের আছে এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য এখনও নিয়মিতরূপেই অনুশীলনে বিশ্বাসী। তাঁর কাব্যের নতুন চেহারা যদি বা না দেখতে পাওয়া যায় তথাপি তাতে আরো গাঢ় বর্ণ-লেপন ও গভীর অনুভূতির কথা থাকবে এমন আশা অসঙ্গত নয়, কেন না নিয়মনিষ্ঠ চর্চাই কাব্যপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎসমূল।

২

অজিত দত্তের কাব্যে স্ববিরোধ বর্তমান। স্পষ্টত বোঝা যায়, মানসিক টানাপোড়েন না হোক্, দ্বিমুখী ধারার স্রোত সেখানে পাশাপাশি চলেছে। তাতে অবশ্যই কাব্যের রস ব্যাহত হয়নি, তথাপি তাঁর কাব্যের প্রসাদগুণ যে আত্মনিমগ্ন প্রেম নয় সে কথা বুঝতে তার যুগ কেটেছে। রূপকথা বা অসম্ভব কল্পনাশ্রয়ী ভাবানুষঙ্গ তার কবিতার আশ্রয়, এমন মনে হওয়া কিছু অযৌক্তিক নয়, যেমন—

কন্যার সোনার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ
কন্যার বুকের পরে নাগিনীর সোনার কাঁচুলী.

অথবা

এমন অদ্ভুত রূপ আছে কোন রাজকুমারীর ?
এমন চোখের পাতা (কুমার দেখেছে স্বপ্ন তা'র)

কিম্বা প্রেম, 'সনেট' কবিতাটি ধরা যাক্, যেখানে মুহূর্তকে চিরন্তন করবার অভিলাষে তিনি পৃথিবীর জনস্রোত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি ; তথাপি আমার মনে হয়েছে. উভয় ভাবনাই শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট ও অনভিব্যক্ত থেকে গেছে। যে অসম্ভব ও তীব্র আস্বাদে কবিতার শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়. যে রূপকল্প ধীরে ধীরে কবিতার আত্মাকে বর্ণনার অতিরিক্ত লাবণ্যে বরণীয় করে তা তাঁর কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্যই জীবনের কোন অনুভবই একমাত্র অনুভব নয়, কোন একক অভিজ্ঞতাই চরম অভিজ্ঞতা নয়, সমগ্র জীবনের নানা স্তরের চেতনাই তাকে ক্রমশ সম্পূর্ণ ক্রমশ সার্থক করে তোলে, তবু অনুরূপ উত্তরণে তাঁর কাব্য সুচিহ্নিত নয়। এর কারণ অজিত দত্তের মানসিকতায় একই সঙ্গে একটি সরস কৌতুকের দীপ্তি প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। ইংরেজী স্যাটায়ারিষ্ট কবির বাংলায় পারিভাষিক শব্দ আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন রোমান্টিকতার সঙ্গে স্যাটায়ার-এর এক আশ্চর্য সন্ধি তিনি স্থাপনা করেছেন। এবং এই সন্ধি স্থাপনা করতে তাঁকে যে স্ববিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে তাঁকে অতিরিক্ত মাশুলই দিতে হয়েছে, ফললাভ ততটা ঘটেনি। তার স্বাক্ষর বহু কবিতায় বর্তমান।

যুদ্ধকালীন কবিতার কিছু কিছু 'নষ্টচাঁদ' কাব্যগ্রন্থে স্থানলাভ করেছে, কিন্তু সমস্যামূলক বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাঁর মানসিকতাকে ততখানি অনুপ্রাণিত করতে পারেনি ; সেদিক থেকে 'নষ্টচাঁদ'-এর প্রথম কয়েকটি কবিতা প্রায় অসার্থক। কিন্তু যেখানে তিনি সমাজ বা মানুষের জীবনকে একটু দূর থেকে দেখেছেন, স্মিত না হোক, সরস কৌতুকের সঙ্গে তার পরিচয় জানতে চেয়েছেন সেখানে তিনি অনেক সার্থক কবিতা রচনা করেছেন। গোড়াকার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যণীয়, কিন্তু অনুভাবনার দিক থেকে তিনি ক্রমশ সরে এসেছেন। তাঁর সনেটগুলি প্রচলিত নিয়মেই লেখা, তথাপি এই সনেটগুলিতে যে দৃঢ়বদ্ধ ঋজুতা রয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে যে সাযুজ্য ও

অর্থঘনতা প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর কবিক্ষমতার অসংকোচ সাক্ষ্য। সনেট-গুলির বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে যেমন জন্মলাভ করেছে আবার দু-এক স্থানে সমাজ সচেতন মনেরও প্রকাশ দেখেছি। আমার যতদূর মনে হয়, অজিত দত্তর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা (শুধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট নয়) 'রাজা,' প্রথম আটটি পংক্তি যার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা ;
উষ্ণীষ-আভরণ সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে রাজার দোকানে,
ঘরে আছে হেঁঠো ধুতি, কড়া সাজা দুছিলিম গাঁজা,
হুকুমের জরু আছে, আছে তাঁড় আর তেলেভাজা—
আরেক রাজার পার্ট—ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।'

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সংকলনে তাঁর 'সনেট' নামে যে বিখ্যাত কবিতা 'পাতালকন্যা' বইটি থেকে সংকলিত হয়েছে তার সঙ্গে পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে স্পষ্ট বোঝা যাবে, বাংলা ভাষায় আধুনিক কালে 'সনেট' নামক কবিতাটি একাধিক কবি লিখতে পারতেন, পেরেছেন, হয়ত আরো ভালো সনেটও তাঁরা কেউ কেউ লিখে থাকবেন, কিন্তু 'রাজা'র মত সনেট অন্য কোন কবির পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। আমার ধারণা, এ পর্যন্ত কেউ এ ধরণের কবিতা এত সার্থকভাবে লিখতে পারেন নি। এ থেকে এ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না, অজিত দত্তের প্রতিভা রোমান্টিকতায় নয়, এমনকি তার প্রথম যুগের রূপকথা-আশ্রয়ী মানসিকতার প্রতিফলনেও নয়, বরং এ রকম সরস ব্যঙ্গ ও প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। যে সমস্ত শব্দ সাহসের সঙ্গে তিনি কবিতাটিতে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর অশেষ শক্তি-মত্তার প্রমাণ মেলে। শুধু এই শক্তিমত্তাতেই কবিতাটি ফুরিয়ে গেলে এটিকে এত মূল্য নিশ্চয়ই দেওয়া যেত না। এই ছোট্ট চৌদ্দ লাইনের সনেটটিতে বর্তমান কালের মানুষের প্রকৃত স্বরূপটি আশ্চর্য ও তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। যেখানে শুধু সরস কৌতুক ও ব্যঙ্গই নেই, আছে সহানুভূতি ও বিয়োগান্ত নাটকের করুণ রসও। 'ছায়ার আলপনা' কাব্যগ্রন্থটিতে এমনতর আরো

যে কয়েকটি সনেট রয়েছে তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফানুস', 'ছাগল' অথবা 'ভোট'—এ কয়টি একসঙ্গে পড়ে গেলে একথা নিশ্চিতই মনে হবে, অজিত দত্তের কবি-প্রতিভার গতি-নির্দেশক নিছক কল্পনা-প্রবণতা নয়, বরং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে তির্যক অথচ সহানুভূতিশীল একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গি। ইংরেজীতে যাকে বলে সাবজেকৃটিভ, তাতে তাঁর হাত তত খোলে না, যতটা খুলেছে অবজেকৃটিভ কবিতায়, এদিক থেকে তাঁর বুদ্ধদেব বসু অথবা সঞ্জয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রভূত ফারাক। কেননা, যেখানে তিনি সাবজেকৃটিভ হতে গেছেন সেখানে তিনি সমসাময়িক অন্য কবির স্পষ্ট প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন নি। দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

এ-দেহ কুৎসিত হবে, আকুঞ্চিত কপাল কপোল,
বিস্বাদ অধর, ওষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ তরল-তারকা,
যৌবন ঝরিয়া যাবে, শুধু যেন থাকে যৌবনের
একমাত্র অবশিষ্ট এই কথা—'আজো ভালবাসি' (জরাস্বপ্ন—
কুসুমের মাস)

অথবা,

আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা
দুর্নিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা (পাখী আর তারা)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটিকে বুদ্ধদেব বসুর রচনা বলে ভুল করা আশ্চর্য নয়। অবশ্য, এমন হওয়া সম্ভব—দুজন কবি, যাঁরা বিশেষত ব্যক্তিজীবনে ঘনিষ্ঠ, চিন্তা ও কল্পনায় যদি সাযুজ্য থাকে, নিজেদেরও অজান্তে, একে অন্যকে প্রভাবিত করে। শক্তিশালী কবি সে-প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন এবং তার স্বকীয় ধর্মেই আস্থা রেখে চলেন। অজিত দত্তও 'ছায়ার আলপনা' গ্রন্থে নিজের সুরটি খুঁজে পেয়েছেন এবং যে বিশেষ ঢং-এ, যে পূর্ণাঙ্গ সনেটের আবরণে অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাগুলি লিখেছেন তাতে তার চরিত্র ফুটে উঠেছে, আংশিকভাবে বাংলা কবিতাও কিছুটা গতিশীলতা লাভ করেছে। কেননা, এ সকল পংক্তি যেমন—

অতিসত্য পৃথিবীতে সংক্ষেপে ইহারে কয় ভোট,
অত্যুচ্চ মস্তিষ্কগুলি চাঁটা খেয়ে ঢুকে যায় পেটে,
যত উগ্র কণ্ঠ আর যতই দুরন্ত বাহ্বাস্ফোট
জনতার স্বয়ম্বরে মালা পায় ততই নিরেটে। (ভোট)

বাংলা কবিতায় খুব বেশী লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই, অথবা 'অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ভুমো ভুমো কিম্বা মিহি কিমা, স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে' (ছাগল)—এ রকম তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাংলা কবিতার সমকালীন ধারায় (একমাত্র সুকুমার রায়কে বাদ দিলে) প্রায় অপরিচিত। অতি-দার্শনিক, অথবা অতি সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা কাব্যের গতিপথ যে বেশ কিছুটা জটিল ছিল এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে সময় এমন একটি detached মনোভঙ্গি হালের কবিতায় নতুন রসের যোগানদার হয়ে এল। অন্য এক স্থানে তিনি একথাও বলতে দ্বিধা করেননি, 'মানুষের মূর্খতায় বিদ্রূপ হাসিতে ভালবাসি।' অজিত দত্ত যে শুধু সমাজমানস ও ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতন তাই নয়, নিজের বক্তব্যবিষয় ও কাব্যধর্মিতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কেও তেমনি সজাগ। তিনি হৃদয়বান কবি অথচ হৃদয়ের দ্রবীভূত রসে তাঁর শেষের দিকের কবিতা কোমল হয় নি, বরং ঈষৎ চড়া সুরেই কাব্যধারাকে এক বিশেষ খাতে বইয়ে নিয়ে গেছে। তিনি সুস্থ মানসিকতায় বিশ্বাসী, কেননা সভ্যতার মর্মে ঘুণ ধরেছে যে বিশেষ পরিবেশের ফলে তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। 'নষ্টচাঁদ'-এ সন্নিবেশিত কবিতাগুলি যদিও কাব্যের প্রসাদগুণে খুব চড়া মূল্যে বিকোবেনা তবু তার সমকালীন সমাজবিষয়ে এই সজাগ দৃষ্টির সবিশেষ তাৎপর্য ছিল, বিশেষত পূর্বে উল্লিখিত কবিতাগুলির ভাব-অনুষঙ্গ এ সকলেরই পরবর্তীকালীন প্রতিরূপ।

৩

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় অবশ্য এ বিরোধ নেই। মূলত তিনি মানব-চেতনার উত্তরণে বিশ্বাসী। এই চেতনা ততটা দার্শনিক মনোভঙ্গি থেকে সঞ্জাত নয়, যতটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে।

তুমি সেই পৃথিবীর মন
যে-মন সুরভি হয় ফুলে।

তুমি সেই আকুল আকাশ
অকূল, অবাক ধ্বনি নিমীলিত সমুদ্র রমন ;
নিমীলিত সমুদ্রের আবরণ খুলে
আগুনের কারুকলা তুমি—
যে-আগুনে জ্বলে মরুভূমি
যার অনুরাগে জাগে ঘাস।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'আকুল আকাশ'-এর তাৎপর্য ধরা একমাত্র তাঁরে পক্ষেই সম্ভব যিনি অনুরূপ চেতনায় বিশ্বাসী। মানবের (জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় 'মানুষ' শব্দের পরিবর্তে 'মানব' কথাটির ব্যবহারই বোধ হয় বেশী ইঙ্গিতপূর্ণ, কেননা এঁরা উভয়েই মানবজীবনের এই দীর্ঘ প্রবহমান ধারার ইতিহাস থেকে কাব্যের মূল চেতনাকে আশ্রয় করেছেন) মুক্তিপ্রয়াস চিরকালের সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করে আছে। এবং আকাশের উন্মুক্ততা তাকে বার বার বিভ্রান্ত করেছে, আকুল করেছে। এই যে দুর্মর আকাঙ্ক্ষা—এর প্রতাক হিসাবে তাঁর কবিতায় বার বার আকাশের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। এবং একই সঙ্গে প্রবহমান জীবনের শান্ত স্তব্ধ নৈঃসঙ্গের যে অপরূপ তন্ময়তা আছে তাও তাকে নানা সময়ে আশ্বস্ত করেছে—আলোকের পাদপীঠে ছায়ার বিস্তারের মত এই কবিতা নরম ও বেদনার্দ্র ; তাই ছায়ার প্রতীকও ঘুরে ঘুরে এসেছে। প্রতীকী কাব্যের অন্যতম লক্ষণ হোল, চেতনা ও অনুভাবনাকে ঘিরে যে সকল ছবি মনে আসে বারংবার তারই দীর্ঘ অনুরণন। সেই ছবিগুলো একের পর এক সব সময় জ্যামিতিক শৃঙ্খলে আসে না হয়ত, কিন্তু তার পৌনঃপৌনিকতায় মনকে একটি বিশেষ প্রেক্ষিতের দিকে নিয়ে যায়। রাঙা অন্ধকার, আগুন, লাল. ঝলমল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ক্রমশই একটি আভাস মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। যে প্রারম্ভিক চেতনা থেকে উপরোক্ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে ঐতিহ্যগত একটি সুসম্বদ্ধ মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয় এবং অবশেষে নিশ্চিত পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে তাঁর কবিতা প্রতীক অন্বেষণে ব্যস্ত—

আমার আলোর মত ছুঁড়ে দেয় মুঠোমুঠো তারা
আমার পাতাল—তার চারদিকে রাত্রির পাহারা
এখানে পৃথিবী নেই পৃথিবীর ফুলে আর ঘাসে।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এঁর কবিতাই জীবনানন্দের কাব্যের মেজাজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম। কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে (অবশ্য চিত্রকল্প ব্যবহারে নয়), পারিপার্শ্বিক ও সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারের অনুভব চেতনায় এঁরা অনেক সময় নিকট আত্মীয়ের মত পাশাপাশি চলেছেন, যেমন—

আমার জীবন এলো, ছিল তার আরেক আকাশ
সেখানে পাখীরা আসে রোদের মতন

ইত্যাদি পংক্তি যেমন সুন্দর সুস্থ কবিতা, অন্যদিকে বিরাট গভীরতার ইঙ্গিতও। অবশ্য বহুস্থানে উপযুক্ত ছবির অভাবে পরিপূর্ণ আবহাওয়া তৈরী হয়নি। 'চৈত্রের আগুনে লাল ঝলমল মন'—একথা বললে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে পরিষ্কার উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে চিত্রটির সকল সম্ভাব্য দিক তখন 'একটি সবুজ মেয়ে ভেঙ্গে গেছে কাঁচের মতন', বললে, 'সবুজ'-এর অর্থবহুতা মনকে ততখানি স্পর্শ করেনা। করিতার অন্যতম লক্ষণাক্রান্ত নির্দেশ হচ্ছে এর immediacy of appeal—বাংলায় তর্জমা করলে কি দাঁড়ায় জানিনা তবে 'দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা'—একথা যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন সে মুহূর্তেই মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়। একটি অজানা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ধীরে ধীরে সমগ্র মনকে প্রভাবিত করে তোলে। এবং মনে হয়, বহুক্ষণ পর্যন্ত এরই নিশ্চিত অনুরণন চলতে থাকবে।

ইতিহাস, ভূগোল ও মানবজীবনের নানা অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যের পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে। অনেকস্থলে ঘটনাপঞ্জী হয়ে গেছে—'প্রাচীন প্রাচী' কাব্যগ্রন্থটি এই ঐতিহ্যে রচিত এবং যদিও একটি বিরাট ভাবনা তাঁকে আশ্রয় করেছিল, তিনি তার সার্থক রূপদানে সক্ষম হননি, তাঁর কবিতা intellection-এর সদর পথে আনাগোনা করলেও যে সামগ্রিক চেতনার জারক রসে কবিতা বেদনার মাধুর্যে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, 'প্রাচীন প্রাচী'তে তার সাক্ষাৎ মেলেনা বলে দুঃখ হয় এবং দ্বিধা হয়, কাব্যবস্তু সত্যই কি এমন অপূর্ব কিছু, অপ্রাকৃত, যা অনেক সময়, কবিরও অজ্ঞাতে, একটি আশ্চর্য ইঙ্গিতেই সার্থক হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি তাঁর কিছু কবিতা পাঠ করলাম। সেগুলির যথাসাধ্য উল্লেখ না করলে, আমার মনে হয়, তাঁর পরিণতির ধারা সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ থেকে যাব ; ইতিহাস তখনই কবিতা হয়ে ওঠে যখন বিষয়নিবৃত্ত চিত্তে স্মৃতিচারণা সম্ভব।

হালের কয়েকটি কবিতা থেকে আমার এই ধারণাই হয়েছে, জীবনের অতীত অভিজ্ঞতাকে তিনি কেবলই স্মৃতিতে পর্যবসিত করতে চেয়েছেন, সেখানে বর্তমান মৃত, ভবিষ্যৎ অকল্পনীয়। একসময়ে তাঁর কবিতায় existence-এর যে চেতনা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে, তা এই পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য স্মৃতিচারণায় সমৃদ্ধ—

> এখন তোমার মুখে হৃদয়ের সাধ
> সজল মেঘের মত তার বর্ষা পায়।
> পৃথিবীর রৌদ্র যাকে নিয়ে গেছে রূঢ় মৃগয়ায়
> ফিরে সে হরিণ হয়ে আসে,
> কাঁপে ঠোঁট, মুখ রাখে ছায়া-ছায়া ঘাসে।

(পূর্বাশা, বৈশাখ ১৩৬৪)

সমর সেন ও আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র

সমর সেন সম্বন্ধে আমার বরাবরই একটা কথা মনে হয়েছে: বাংলা কবিতার তিনি একটি বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন। অবশ্যই সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে। তাঁর কবিতার সমাদর উত্তরসূরীরা কতটা করবেন জানা নেই—কিন্তু এ সবিনয় স্বীকৃতি যথার্থ যে তাঁর কবি-ভূমিকার অবর্তমানে এত অনায়াসে বাংলা কবিতার গতানুগতিক জড়তা কাটিয়ে আমরা কবিতা লিখতে পারতুম না। এমন কিছু সৃষ্টিকার্য তাঁর ছিল না যাকে মহৎ বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর প্রতিভার দ্যুতি। কিন্তু এমন একটি সতেজ, বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ছিল, বাঁধনভাঙার এমন অনায়াস কারুকর্ম তাঁর সহজায়ত্ত ছিল, যা ভাবতে বিস্ময় লাগে। এমনি কবিরা প্রায়ই সাহিত্যের ইতিহাসে আসেন, যাঁরা হয়তো খুব বড় কবি হতে পারেন না, অথচ বড় সৃষ্টি-কার্যের অন্যতম প্রধান সহায়ক হন। রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখা কত দুরূহ, একথার প্রমাণ আমরা পেয়েছি—তাঁর সমসাময়িক বহু প্রতিভাবান কবির লেখা আমাদের প্রাণে আর সাড়া জাগায় না। রবীন্দ্রনাথের পর কল্লোলযুগের কবিরাও এলেন, প্রথম বয়সের রচনায় তাঁদের রবীন্দ্রনাথের ছাপ সুস্পষ্ট। সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী—সবাই তাঁকে স্মরণ ক'রে না হোক, বিস্মৃত হয়ে লিখতে পারেননি। সেই সময়ে সাধুবাদ দিতে হয় অপেক্ষাকৃত তরুণ এই কবি পথিকৃৎকে। যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও যেন শহুরে জীবনের এই 'বিভ্রান্ত' কবি তৎকালীন আদর্শহীন, পঙ্গু, ব্যর্থ জীবনযাত্রার ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, সত্যি কথা বলতে কি, এড়ানো সম্ভব নয়। তবুও সমর সেনের রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা জীবনাদর্শের প্রতিধ্বনি নয়। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। সেই সময়ে সমর সেনই একমাত্র কবি, যিনি স্বচ্ছন্দেই তাঁর তথাকথিত প্রভাব এড়িয়ে গেছেন—যদিও প্রভাব এড়াবার কঠিন প্রচেষ্টা তাঁকে সব সময়েই করতে হয়েছে।

সমর সেনের কবিতা-প্রসঙ্গে যে কথাটি প্রথমেই মনে হয়, তা হচ্ছে অন্তর্-বিরোধ। যাঁরা একদা মাসিক পত্রিকায় সমর সেনের কবিতার লাইন তুলে তুলে পাঠকদের বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে, এর মধ্যে এক বর্ণও কবিতা

নেই, তাঁদের অনুরোধ করি, সমর সেনের কবিতা আবার নতুন ক'রে পড়তে; অনুরোধ করি, আধুনিক কবিতার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবান হয়ে যেন তাঁরা কবিতার দোষগুণ বিচারে যত্নবান হন।

হাওয়ায় মেঘের শব্দ
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ শহর

*   *   *

বৃষ্টির শেষে বিষণ্ণ শান্ত ইন্দ্রধনু,
তবু বারে বারে মনে হয়—
এখানে হাওয়া নেই,
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।

*   *   *

পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই:
দিনের ভাটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধূ ধূ করে,
চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে।

এমনি আরো অসংখ্য পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে দেখানো যায়, আর নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়, সমর সেন আর কিছু নাই লিখুন, কবিতাই লিখেছেন। সমর সেন যে জাত কবি একথা আমার মতন এখন আরো অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং প্রায় সকল জাত কবির মতই তারও কাব্যের মূলে একটি অন্তর্বিরোধ ছিল। সেই অন্তর্বিরোধের সূত্র কি এবং এই অন্তর্বিরোধ তাঁর কবিতাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, সেকথা সমালোচকের ভাষায় বলতে গেলে অনেকটা এই বলা যায়—এই কবি নিজেই নিজের কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছেন। কবিমাত্রেরই যে একটা অন্তর্বিরোধ আছে এবং তা তাঁর সৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে, এ অন্তর্বিরোধের শেষ কোথায়, ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা করলে সমর সেনের কবিতার একটি ধারাবাহিকতা ও তৎকালীন কাব্যের ধারার সঙ্গে তাঁর কবিতার যোগাযোগ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাবে।

সমর সেন যে সময়ে কবিতা লিখেছেন, সেটা বাংলা দেশে কবিতা রচনার পক্ষে অনুকূল ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ দেশে কোনরকম রাজনৈতিক গোলযোগ রোজ-রোজ মাথাচাড়া দেয় নি; বরং সমস্ত দেশময় যে

স্বাধীনতা আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তার একটি মহান ঐতিহ্য সমাজ-সচেতন মানুষের মনে সৃষ্টিকার্যের অনুকূল আবহাওয়াই তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু তখনো হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের কোন প্রভাবই অবশ্য আমাদের দেশে পড়ে নি, যাতে এদেশের সমাজমানসে কোন বড়রকমের পরিবর্তন আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রথম মহাযুদ্ধের রেশ ততদিনে মিলিয়ে গেছে বলেই সব দেশে একটি নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগঠনের দায়িত্ববোধ দেখা যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকার্য তখনো অব্যাহত। গদ্যকবিতার আরম্ভ তাঁরই হাতে, 'লিপিকা'র অপূর্ব কবিত্বময়তায় আমাদের প্রাণে সুরের স্পর্শ লেগেছে; ছন্দকে মুক্তি দেওয়ার স্বাধীনতায় কবির যে রোমাঞ্চ, তারই আনন্দে অনেকেই উদ্বেল। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ উনবিংশ শতকের মূল্যবোধের চেয়ে নিশ্চিত-রূপেই পৃথক হয়ে যাচ্ছিল, যদিও নতুন কোন মূল্যবোধে আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আসে নি। সত্যেন দত্ত বিগত, নজরুল ইসলামের লেখনী বন্ধ। এরকম সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশে একদল কবি নতুন ক'রে, ভাবে-ভাষায়-আঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভাঙচুর ক'রে কবিতা লিখতে চাইলেন। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সার্থক কবি সমর সেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম কতটা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, জানি না; কিন্তু আগামী কালের কবিরা বুঝবেন, কি দুরূহ কাজ তিনি করেছিলেন। বাঁধ ভাঙবার দৃঢ়তা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার প্রভাব সযত্নে এড়িয়ে তিনি কবিতা লিখে গেছেন এবং এমনি ক'রে আমাদের ইঁটখোলা রাস্তাকে মসৃণ সমতল ক'রে দিয়ে গেছেন এবং তাঁর পুরস্কারস্বরূপ একদল সাহিত্য-ব্যবসায়ীর কাছে তিনি নিন্দিত হয়েছেন। এর চেয়েও বড় ক্ষতি তিনি স্বীকার করেছেন স্বেচ্ছায়—তিনি একটি বিরাট টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে কবিজীবন থেকে দূরে সরে গেছেন। সহজেই একথা বোঝা যাচ্ছে, তিনি যেভাবে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তার পেছনে কোন সামাজিক অথবা ঐতিহাসিক সত্তা কাজ করে নি। তিনি নিজেই তাঁর পথ বেছে নিয়েছেন এবং সেইজন্য যে ক্ষতিপূরণ তাঁকে ভবিষ্যতে দিতে হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। তাঁর ভেতরে যে অন্তর্বিরোধ, এ তাঁর স্ব-ইচ্ছাপ্রণোদিত—ব্যক্তির জীবনে বিচিত্র রামধনু যেন। সে সময়ে—ইংরেজি তিরিশ শতকে—যে শান্ত, স্তব্ধ নদীর মধ্যগতি বাংলার সামাজিক পটভূমিতে বিরাজমান, তাতে কোন কবিকে ক্ষুব্ধ করে না; যান্ত্রিক

সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু রূপ তাঁর চোখে পড়বার নয়—অন্তত এ দেশে। তবুও যেন কতকটা কবি-প্রজ্ঞা দ্বারাই সমর সেন বুঝেছিলেন, বাঙালী জীবনের ব্যর্থতার চরম দৈন্য কোথায়, নিরাশার অন্তর্নিহিত রূপটি কেমন। সমাজের, ব্যক্তিসত্তার ও সহনশীল মানুষের জীবনে যে বিরাট ভাঙচুর আজকের দিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বন্যাদুর্ভিক্ষোত্তর বাংলা দেশে আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করেছি, সমর সেন যেন আরো এক যুগ আগে এমনি ঘটনা, এমনি সর্বগ্রাসী তোলপাড়ের কথা ভেবেছিলেন। বাঙালীর সমাজ-মানসের এই ছোট্ট ইতিহাসটি তৎকালে আর কোন কবি আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন বলে আমার জানা নেই।

অনেকে ঠাট্টা ক'রে থাকেন—যাঁরা প্রতিপক্ষ, যাঁরা সত্যেন দত্তে বা নজরুল ইসলামেই বাংলা কবিতার বৈতরণী মনে করেন—তৎকালীন আধুনিক ইংরেজ কবিদের গদ্য অনুবাদ ক'রে বাংলা কবিতা রচনার সার্থকতা কোথায়! একথা একেবারেই অমূলক, এমন আমি মনে করি না। বিশেষ ক'রে যাঁরা এলিয়ট পাউণ্ড জয়েসের ভক্ত পাঠক তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন রয়েই যাবে। উপরন্তু তাঁরা বলতে পারেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা ইয়োরোপে মানবসভ্যতা যে বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল, তাতে এলিয়টের মত দার্শনিক কবির পক্ষে হয়তবা সমগ্র মানবজাতিকে নিয়তিনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এমন কল্পনা করা অযৌক্তিক ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে কতটুকুই বা বাংলা দেশের কবিকুল তৎকালে বিশ্বমানবের পটভূমিকে আশ্রয় করেছিল,—সময়ের ব্যাপ্তি, দেশ কাল পাত্রের বিভিন্নতা যেন ধুয়ে মুছে গেল। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির মূল তত্ত্ব পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায়—in a complete art form—হয়ত সমর সেনের কবিতায় সব সময় complete art form ছিল না; কিন্তু তা যে art form, তা যে সৃষ্টি অথবা স্থানবিশেষে পূর্ণসৃষ্টি—এতে আমার সন্দেহের অবকাশ নেই। নইলে 'হুতোম পেঁচার নক্সা' থেকে বহু পংক্তি হুবহু তার কবিতায় ব্যবহার করে তিনি যে অনন্য স্বাদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার কোন মূল্যই থাকতো না! ধার-করা ভাবে আপত্তি নেই, ভাবান্তরেও ক্ষোভের কিছু নেই; যিনি কবিতা চেনেন, যিনি সত্যিকার জহুরী, তাঁর চিনতে ভুল হবে না—খাঁটি কবিতা কোনটি।

কোন নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেখলার মত শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মত মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম;

অনেকটা জীবনানন্দ দাশের সুর লাগে এই ক'টি লাইনে। কিন্তু জীবনানন্দ যেখানে ছবির পর ছবি এঁকে, কারুকার্যের পর তুলির টানে আরো রং, আরো ভঙ্গি এঁকেছেন—একটি পরিপূর্ণ স্তবকে আমাদের মনকে বিমুগ্ধ করেছেন, এই তরুণ কবি সেখানে সুরে-বাঁধা সেতারের তার ছেঁড়ার মতই অকস্মাৎ রোম্যান্টিকতা যেন স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এসে হাঁটু-কাপড়ে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লেগে গেছেন। উদ্ধৃত কবিতাটির পরের চার লাইন এই রকম :

আর আজও তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পেছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী
আর বন্যার মত পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন ;

ইংরেজি অর্থে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ কথাটি বাংলা কবিতায় এলো উনিশ শতকের শেষভাগে ; আবার প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ কবিরা যখন কবিতা থেকে রোম্যান্টিসিজ্‌মকে উৎখাত করতে চাইলেন, সেই দুরন্ত ঢেউয়ের আলোড়নও আমাদের দেশে এই বাংলা কাব্যে এলো। আর, এখন বলতে বাধা নেই, তেমন দিনে আমাদের দেশের তৎকালীন নবীন কবিরা কাব্যের উৎস খুঁজতে অনেক সময়েই বাংলার নদী-বন-লোকালয় ছেড়ে ইংরেজি কবিতার শরণাপন্ন হয়েছেন। তাতে উপকার হয় নি, এমন নয় ; আবার অন্যদিকে মেকী জিনিষে কাজ সারতে হয়েছে। সমর সেনও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি যেমন একদিকে বাঁধভাঙার দুরূহ কাজ ক'রে তরুণতর কবিদের গুরুস্থানীয় হলেন, অন্যদিকে কাব্যের সুস্থ, সমাহিত ও আনন্দিত রূপটিকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের পথে কাব্যলোকের আস্বাদন খুঁজলেন। আরো পরে, যখন সময়ের নিষ্ঠুর বিচারে সব কিছুই যাচাই হবে, তখন বলা যাবে হয়তো, সমর সেন এমন একজন কবি ছিলেন, যাঁর দায় ছিল, দায়িত্ব ছিল না।

আর একটা কথা বলেই এই আলোচনা শেষ করব। 'ফ্রি ভার্স' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ সঠিক কি হতে পারে, আমার জানা নেই। গদ্যকবিতা অথবা মুক্ত ছন্দের কবিতা—কোনটিই সুখী নয়। যাই হোক, এদিকে সমর সেনের দান অবিস্মরণীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এত সার্থক ফ্রি ভার্স কেউ

লিখেছেন কিনা, অন্তত বাংলা ভাষায়, আমার সন্দেহ। তিনি জানতেন যে, এ শুধু গদ্য নয়, অথবা শুধু কবিতা নয়। (শুধুমাত্র দুটির মিশ্রণে যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতা, যাকে নতুন সৃষ্টি বলে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, তাই তাঁর কবিতায় পুরোপুরি উপস্থিত। যে পংক্তিগুলি আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, গদ্যকবিতা সম্বন্ধে সমর সেনের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। গদ্যভঙ্গির ঋজুতা ও পারম্পর্য সেখানে উপস্থিত, কাব্যের স্নিগ্ধ সংবেদনশীলতা ও একাধিক ছবির নিপুণ উপস্থিতিও চোখ এড়ায় না। (অর্থাৎ তাঁর কবিতাকে একই সঙ্গে গদ্যময় ও কাব্যময় বলা চলে।) তিনি এই ভারসাম্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, আর সেইজন্যেই তিনি উত্তরসূরীদের কাছে এখনো দৃষ্টান্তস্বরূপ। এদিক থেকে তার প্রতি আমাদের ঋণের শেষ নেই।

আধুনিক ইংরেজী কবিতার প্রেক্ষিত

আধুনিক শব্দটির কোন মাপকাঠি নেই। চসারকে আধুনিক ইংরেজী কাব্যের জনক বলা হয়ে থাকে, বিশ শতকে যখন এলিয়ট 'লাভ সং অব আলফ্রেড প্রুফ্রক' লিখলেন তখন আবার সম্প্রতিকালে আধুনিক শব্দটির প্রয়োগ দেখো দিল। আধুনিক কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত এক-পেশে হলেও সাধারণভাবে সত্য। কবিতার প্রাথমিক দুটি ধর্ম, কালধর্ম ও যুগধর্ম, কবিকে একই সঙ্গে প্রভাবান্বিত করে। কালধর্ম অর্থে ট্রাডিশন ও যুগধর্ম অর্থে রিয়ালিটি : এ দুয়ের পারম্পর্যবোধের উপর কাব্যের স্বীকৃতি। আধুনিকপন্থী কবিকেও মেনে নিতে হবে ক্লাসিক কবির মানসিক গঠন কাব্যের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নয়, রোমান্টিক কবির সৌন্দর্য সুষমা নিছক উপকরণ মাত্র নয়। প্রবহমান ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব অথচ সমসাময়িক জীবনের ভাঙাগড়ার মৌলিক অনুভূতিপ্রবণতা একই সঙ্গে কবিচিত্তে প্রতিফলিত হয়। বিয়োগান্ত নাটকের নায়ককে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়, যে বিরাট চেতনাবোধ ও তজ্জনিত যন্ত্রণা তাকে পরিশেষে মুক্ত করে, ফলস্বরূপ যে ক্যাথারসিস্ এর উদ্ভব—এ সকলই কবিচরিত্রে লক্ষণাক্রান্ত গুণাবলী। সুতরাং কবিতা প্রসঙ্গে আধুনিক শব্দটির ব্যবহারে আরো সযত্নকুশল হতে হবে, যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে।

মুখ্যত, ভিক্টোরীয় জীবনবোধের দুটি ধারার একদিকে পূর্ণাঙ্গ চিত্রকুশলতা, অপরদিকে মানসিক বিক্ষোভ; একদিকে নিশ্চিতি, অন্যদিকে সন্দেহ। এতৎসত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠনধারায় যে ভাবটি অবিকৃত ছিল তা সাহিত্য, বিশেষ করে কাব্যকে নতুন দিগ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করেনি; কিছু কুণ্ঠা, কখনও বিশ্বাসের ভাঙচুর ও শেষভাগে শিল্পদৃষ্টির মাধ্যমে কাব্যবোধ ও তৎকারণে প্রয়োগকুশলতা প্রধানত উপজীব্য ছিল। ব্রাউনিঙ্‌এর কাব্যে যে দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাস তা একাগ্রমুখী, মননের গভীরে রহস্যলোকের সন্ধান অবশেষে সমাহিতপ্রায়। জাতীয় চরিত্রগুনে ইংরেজ রক্ষণশীল অথবা উদারনৈতিক সে বিতর্ক উপস্থিত না করেও বলা যায় সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যে যে ফুল যেখানে ফুটেছে তার চারাটিই নিজের বাগানে এনে রাখবার সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা

গেছে। অন্যদিকে স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও ফলস্বরূপ ক্রমবিস্তৃত উপনিবেশগুলির মালিকানাসত্ব সম্পর্কে যত্নশীলতা—এ ধরণের মনোবৃত্তিই বিংশ শতকের গোড়ার দিকের ইংরেজী কবিতার অন্যতম প্রণিধানযোগ্য বিষয়। একদিকে জয়েস্ ও এজরা পাউণ্ডের মত অপাংক্তেয় কবি ও অন্যপ্রান্তে কিপ্‌লিং রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতি জনপ্রিয় কবি—এদের নির্বিরোধ কাব্যচর্চা স্বতঃই বিস্মিত করে। পাশাপাশি দুটি উদ্ধৃতি একথার যাথার্থ প্রমাণিত করবে :

At night when close in bed she lies
And feels my hand between her thighs
My little love in light attire
Knows the soft flame that is desire

(James Joyce : *The holy office*)

The Garden called Gethsemane
In Picardy it was,
And there the people came to see
The English soldiers pass.

(R. Kipling : *Gethsemane*)

স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হচ্ছে দুটি কবি দুটি ভিন্ন জগতের মানুষ। অথচ আশ্চর্য এই ইংলণ্ডের সাহিত্যাকাশের বিস্তৃতি। কিন্তু তারপরে কিপ্‌লিং প্রভাবান্বিত পাঠকগোষ্ঠি অন্য এক অনুভূতিপ্রবণতার স্বাদ পেলো রবার্ট ব্রীজেস এর সৌন্দর্যসাধনায়, হার্ডির নিষ্ঠুর নিয়তিবোধের সুনিশ্চিত শূন্যতায়, অথব ইয়েটস্ এর অপাপবিদ্ধ সুস্থ চেতনাবোধে। সুপ্রাচীন অইরিশ গাঁথাকাব্যের স্বপ্নবিজড়িত গোধূলিতে ইংলণ্ডের কাব্যধারা ফুরিয়েও ফুরোলোনা। যে বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত বিবর্তনের পথে কবিমানস এতদিন পরিক্রমারত ছিল, সে পথে আর বোধহয় কাব্যলক্ষ্মী অনগ্রসর, বুঝি বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের যুগে নবলব্ধ জ্ঞান সম্ভারে এক নতুন চেতনাময় প্রাণের সূচনা হয়েছে। এতদিনকার আকাশ-বাতাস, নদীনক্ষত্র সব কিছুর পরে যে মোহাঞ্জন দৃষ্টি ছিল কে যেন মুহূর্তে সরিয়ে নিল। 'দি ফেবার বুক অব টুয়েনটিএথ সেঞ্চুরী ভার্স' নামক সংকলনটির ভূমিকায় তরুণ কবি জন্ হিথ্ ষ্টাব্‌স্ বলেছেন, অধুনিক যুগে এসে আমরা একটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি, এ দ্বন্দ্ব সারল্য ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব।

ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্তও এ সারল্যবোধ অবিচলিত ছিল,—প্রকৃতিকে মানুষকে আত্মীয়তার দাবীতে, বিশ্বাসের ঐকান্তিকতায় সামাজিক বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি পূর্ণ ধারণা বলবৎ ছিল। যে সন্দেহ ও ক্ষীণ প্রতিবাদ ক্রমশ সূচিত হচ্ছিল তাই প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। মানুষ স্নায়বিক অনুভূতির চেতনা লাভ করল, ধ্বংসের চেহারা প্রকট হল, মনোজগতের অন্ধকার অলিগলিতে বিচরণপথে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, সমাজবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের উদ্ধত বিরোধ প্রত্যক্ষ করল। বিগত এক সহস্র বৎসরে যে বিলম্বিত লয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলছিল, মাত্র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তার চেয়েও দ্রুতগতিতে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এতে লাভলোকসানের অঙ্ক কষা বৃথা, গতির সর্বনাশা নেশায় মানুষের ছোট্ট হৃদয়ে মমত্ববোধ, স্নেহ প্রেম শান্তির কাহিনী সব কিছুর মূল্য-বোধ নতুন করে যাচাই হতে লাগল। পাউণ্ডের ইতিহাসচেতনায় যে অন্ত-র্মুখীনতা আবর্তিত গতিপথে শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলার মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ রচনায় যে প্রজ্ঞা তা আমাদের একটি বিচ্ছিন্ন কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। সুতরাং এলিয়ট যখন বললেন :

Under a juniper-tree the bones sang, scattered and shining
We are glad to be scattered,

এবং অবশেষে চেতনার নির্মম অনুভূতি দ্বারা বুঝলেন

We did little good to each other

যে অন্বেষণে বহুদূর তীর্থযাত্রীর মত পথ খুঁজেছিলেন :

This is the land which ye
Shall divide by lot. And neither division nor unity.
Matters. This is the land. We have our inheritance

তখন রবার্ট ব্রীজেস্ এর অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যানুভূতি থেকে পাউণ্ডের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসচেতনার ধারা সম্যক উপলব্ধি করে নিতে অসুবিধে হয় না। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীডের একটি উক্তি স্মরণীয়। শিল্পে জৈবিক ও ভাবকল্প রূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, একটি থেকে অন্য ধারায় যাবার পথে যে রাস্তা অতিক্রম করতে হয় তা দুরূহ, প্রাণশক্তি ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকে, পরিশেষে একটি সুডৌল মূর্তি গড়ে ওঠে। যদিচ রোমান্টিক

থেকে ক্লাসিক ধারার পার্থক্য প্রকাশ করবার জন্মই একথার অবতারণা, আমার মনে হয়েছে উনিশ শতকের প্রকৃতিপূজারীই একদা বিশ শতকে পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিয়ে অবিশ্বাস ও অনীহাজনিত কল্পরূপে জীবনের ও শিল্পের সিদ্ধি খুঁজেছিল। ড্রইডেন প্রসঙ্গে এলিয়ট নিজেই বলেছেন, এ যুগের শিল্প 'কমপ্লেক্স' হতে বাধ্য। এতএব যে দুস্তর ব্যবধান এই দুই শতকের ভাবরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিস্ময় উদ্রেক করলেও নিশ্চিত পথ ধরেই এগিয়েছিল। 'আধুনিক' সংজ্ঞা দ্বারা বিশ শতকের কবিতাকে চিহ্নিত করবার এইটেই প্রধান কারণ বলে ধরা যেতে পারে। যাঁরা অবশ্য ফর্ম এর ওপর ঝোঁক দিয়েছিলেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কামিংস্ গ্রাহাম প্রমুখ কবিরা এ দিকে যে চেষ্টা করেছেন তা পরিশেষে স্বীকৃত না হলেও উল্লেখযোগ্য। এবং তাদের কবিকৃতি যে সমস্যা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা যে কোন ট্রানশিসন যুগের সমস্যারই অনুপূরক।

এর পরও, বিশ ও ত্রিশের কবিদের কাব্যচর্চার যুগ অতিক্রম করেও ইংলণ্ডে আবার নতুন কবিতার ঢেউ উঠল। হাল আমলের কবিদের সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচয় থাকবার কথা নয়। তাদের সৃষ্টিকর্ম এখনও অপ্রচুর, চিন্তা ভাবনার বিভিন্ন দিকগুলি এখনও পরিস্ফুট নয়। তবুও একটি কথা এখনি বোধহয় স্পষ্ট করে বলা যায়। ভিক্টোরীয় যুগ থেকে যেমন বিশ ও ত্রিশের কবিদের বিশেষ করে চিহ্নিত করা যায়, এঁদেরও তেমনি পরবর্তীদের থেকে স্পষ্টই পৃথক মূল্যবোধের অধিকারী বলে মনে করা সম্ভব। অসংখ্য কবির নাম করা যেতে পারে যাঁরা সার্থক কবিতা লিখেছেন। রেমণ্ড সুমি তার সুচিন্তিত রচনায়, Thought in Twentieth Century English Poetry পুস্তকে কয়েকটি বিষয়কে আধুনিক কবিতার বিচারে প্রাধান্ত দিয়েছেন। প্রথমত, সার্বজনীনভাবে গৃহীত কোন মতবাদ আজকের দিনে অচল, দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত অথচ টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত, তৃতীয়ত, প্রচলিত বিধিনিষেধ ও নিয়ম কানুনের প্রতি অনাস্থা, চতুর্থত, বিজ্ঞান ও গীতিকাব্য, অথবা জ্ঞানলাভ ও তার অর্থহীনতা ইত্যাদির আপাত-প্রভেদ—কাব্যের মাধ্যমে এ জাতীয় বৈপরিত্যবোধের মিলনসাধন, পঞ্চমত বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আগ্রহশীলতা, ষষ্ঠত, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষণস্থায়ীত্ব ও ভঙ্গুরতা। এ সমস্ত প্রভাবের উর্দ্ধেও যে কোন কবি স্থিতধী

চিন্তে কাব্যচর্চা করেননি এমন নয়, কভেন্ট্রি প্যাট্মোর, এলিস্ মেনিল, ফ্রান্সিস থমসন্ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এবং যদিচ আরনসন্, বার্কার, ডাইলান্ টমাস প্রমুখ আধুনিক কবিরা সেই স্থৈর্য ও আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন তবু পুর্ব্বসূরীদের থেকে আচরণে ও ইতিহাসগত ধারণায় প্রভেদ সীমাহীন। কিছুকাল পুর্বে প্রকাশিত পি, ই, এন সংকলনটিতে যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তা অনুরূপ ধারণাকেই বদ্ধমূল করে। যে নীতির ভিত্তিতে এই সংকলনটি সম্পাদনা করা হয়েছে তা এবার বর্ণনা করছি। প্রথমত, নতুন কবিদের প্রতি সহৃদয় বিচার, দ্বিতীয়ত, স্পষ্টবাদিতা একটি বিশেষ গুণ এবং দুর্বোধ্যতা পাপ এমন ধারণা, তৃতীয়ত, কবিতার বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট, চতুর্থত, সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহৃত ভাষার আশ্রয়ে কাব্যচর্চা। এবং সর্বশেষে আমার মনে হয়েছে, এই সমস্ত কবিরা জেনেছেন, বর্তমান পৃথিবীর চেহারা এমনি ভয়ঙ্কর যার সঙ্গে পুর্বেকার কোন চেহারাই মিলবে না; তবুও বিশ্বাসকে ফিরে পেতে, জীবনবোধকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, প্রকৃতির সাহচর্যে সুন্দরের বোধকে জাগ্রত করতে হবে; অন্তর্নিহিত প্রেরণাবোধকে যথাযথ অনুশীলনের ফলে রসলোকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে যেতে হবে। এলেক্স কম্‌ফর্টের সহৃদয়তা, আরনসনের সুনিশ্চিত বিশ্বাসবোধ, মরিস্ কার্পেণ্টারের রোমান্টিক তন্ময়তা, ভারনন্ ওয়াটকিন্সের সুগভীর চেতনাবোধ ও সর্বশেষে ডাইলান্ টমাসের জৈবিক অনুভূতি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মস্থতা—এ সমস্তই বিগত দশকের কবিতার ধারা থেকে মূলত প্রভেদ সূচিত করে। এই আশ্চর্য বিকাশের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা ইংলণ্ডের কাব্যজগতের বিস্তীর্ণ আকাশকে অন্তহীন বিস্ময়ের প্রতিকল্প বলেই মনে করবেন।